শাইলকের বাণিজ্য বিস্তার

শাহ্‌যাদ ফিরদাউস

"...মানুষের স্মৃতির কারবারি শাইলক আর তার শিকার সিকান্দারের কাহিনীর আড়ালে শাহ্‌যাদ ফিরদাউস ঠিক এই সময়ের সমাজে ব্যক্তি মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুঁজির আগ্রাসনের গল্পই আমাদের শুনিয়েছেন এই অভিনব উপন্যাসে। স্মৃতি যে কেবল স্মৃতি নয়, ইতিহাস যে কেবল অর্থহীন ভাবালুতা নয়, অনুভূতির পণ্যায়নের এই যুগে খাঁচাবন্দি সিকান্দারের মতো আরো অনেক চরিত্রের চূড়ান্ত অসহায়ত্ব আমাদের সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আমাদের চারিদিকেই তো বহুজাতিকের কাছে জাতীয় নিদর্শন, চিহ্ন আর প্রতীক বিক্রি করা, এক কথায় অতীত বিক্রি করা লাখো সিকান্দার তাদের ভবিষ্যতও শাইলকদের কাছে বন্ধক দিয়ে দিচ্ছে ঘটনার স্বাভাবিক পরম্পরায়! *শাইলকের বাণিজ্য বিস্তার* তাই তড়িতাঘাতে পাঠকের হুঁশ ফিরিয়ে আনার মতো একটি উপন্যাস। এর পরিপ্রেক্ষিত কাল্পনিক, কিন্তু নির্যাস সত্যের মতো-ই তেতো।..."

প্রচ্ছদ : সব্যসাচী হাজরা

শাহ্‌যাদ ফিরদাউস

শাইলকের বাণিজ্য বিস্তার

সংহতি
১৪১৯

শাইলকের বাণিজ্য বিস্তার
প্রথম সংহতি সংস্করণ
ফাল্গুন ১৪১৭, ফেব্রুয়ারি ২০১১
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৪১৯, ফেব্রুয়ারি ২০১৩

প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯
৪৮, আর.কে. ঘোষাল রোড, কোলকাতা

স্বত্ব : লেখক

প্রকাশক
সংহতি প্রকাশন
৩০৫, রোজ ভিউ প্লাজা, ৩য় তলা,
১৮৫ বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড, হাতিরপুল, ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৫
শো-রুম : ১২৯ ও ১০৯, কনকর্ড এম্পোরিয়াম, নিচতলা, কাটাবন, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

অক্ষর বিন্যাস
তৌহিদ
মুদ্রণ
ঢাকা প্রিন্টার্স, ৬৭/ডি, গ্রিনরোড, পান্থপথ, ঢাকা ১২০৫

দাম
একশত ষাট টাকা বিদেশে ৮ ডলার

SHYLOCKER BANIJYA BISTAR
(Shylock goes Global)
By SHAHZAD FIRDAUS
Published by Samhati Prokashan (Samhati Publications).
For further information, Samhati Publications, 305 Rose View Plaza, 2nd Floor
185 Bir Uttam C R Dutta Road, Hatirpul, Dhanmondi, Dhaka-1205, Bangladesh.
E-mail: samhatiprokashan@yahoo.com
Cover Design: Sabyasachi Hazra. Price 160.00 Taka / US $ 8.00.

ISBN 978-984-8882-15-3

উৎসর্গ

নতুন শাইলকদের বিরুদ্ধে
যাঁরা লড়ছেন তাঁদের উদ্দেশে

প্রকাশনা প্রসঙ্গে

শাইলকের বাণিজ্য বিস্তার উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৯ সালে কোলকাতায়। মানুষের স্মৃতির কারবারি শাইলক আর তার শিকার সিকান্দারের কাহিনীর আড়ালে শাহ্‌যাদ ফিরদাউস ঠিক এই সময়ের সমাজে ব্যক্তি মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুঁজির আগ্রাসনের গল্পই আমাদের শুনিয়েছেন এই অভিনব উপন্যাসে। স্মৃতি যে কেবল স্মৃতি নয়, ইতিহাস যে কেবল অর্থহীন ভাবালুতা নয়, অনুভূতির পণ্যায়নের এই যুগে খাঁচাবন্দি সিকান্দারের মতো আরো অনেক চরিত্রের চূড়ান্ত অসহায়ত্ব আমাদের সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আমাদের চারিদিকেই তো বহুজাতিকের কাছে জাতীয় নিদর্শন, চিহ্ন আর প্রতীক বিক্রি করা, এক কথায় অতীত বিক্রি করা লাখো সিকান্দার তাদের ভবিষ্যৎও শাইলকদের কাছে বন্ধক দিয়ে দিচ্ছে ঘটনার স্বাভাবিক পরম্পরায়! *শাইলকের বাণিজ্য বিস্তার* তাই তড়িতাঘাতে পাঠকের হুঁশ ফিরিয়ে আনার মতো একটি উপন্যাস। এর প্রেক্ষিত কাল্পনিক, কিন্তু নির্যাস সত্যের মতো-ই তেতো।

সংহতি প্রকাশন বাংলাদেশে এই বইটির প্রথম সংস্করণ করতে পেরে আনন্দিত। 'সংহতি সাহিত্য' গ্রন্থমালায় আমরা সমকালীন ও চিরায়ত গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্মের সাথে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। তারই অংশ হিসেবে এই গ্রন্থটির বাংলাদেশ সংস্করণ প্রকাশ করা। আশা করি উপন্যাসটি এ দেশেও যথাযোগ্য মূল্যায়ন পাবে।

সংহতি প্রকাশন

পুরোভাষ

বাংলাদেশ থেকে *শাইলকের বাণিজ্য বিস্তার* প্রকাশিত হচ্ছে জানতে পেরে আমি খুবই আগ্রহ বোধ করছি। এই উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় উনিশশো আটানব্বই সালে, *পরিচয়* সাহিত্য পত্রিকার শারদীয় বিশেষ সংখ্যায়। কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে একদিন *পরিচয়ের* তৎকালীন সম্পাদক প্রয়াত কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত, বর্তমান সম্পাদক অধ্যাপক-সমালোচক বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য আর প্রয়াত লেখক-অধ্যাপক বাসব সরকার আমাকে দেখতে পেয়ে আটকে দিলেন এবং লেখা দাবি করলেন। আমি ওঁদের তিনজনকেই গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি বা করতাম। তাই অগ্রজপ্রতিম তিন সাহিত্য-সারথির দাবি সানন্দে মেনে নিয়ে উপন্যাসটি জমা দিলাম। ছাপা হওয়ার পর নানাজনে নানাভাবে আমাকে তাঁদের ভালো লাগার কথা জানিয়েছিলেন। বেশ কয়েকজন চলচ্চিত্রে উৎসাহী ব্যক্তি বা চলচ্চিত্রকার ওই উপন্যাসের চিত্ররূপ তৈরি করবেন বলে প্রাথমিক স্তরে কথাবার্তা বলেছেন। এছাড়া বিগত এক দশকের বেশি সময় জুড়ে কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় পনেরোটা নাট্যদল শাইলকের বাণিজ্য বিস্তারের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করে চলেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের *থিয়েটারওয়ালা* নাট্যদল নিয়মিত ঢাকার মঞ্চে 'শাইলক' মঞ্চস্থ করছে বলে খবর পেয়েছি। এক কথায় বলা যায়, উপন্যাসটির বিষয়বস্তু কোনও না কোনও ভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে স্পর্শ করেছে। কিন্তু আমার এখনকার আগ্রহের কারণ ভিন্ন, যে বিশেষ পটভূমির উপর উপন্যাসটির ঘটনা-প্রবাহ সংঘটিত হয়েছে সেই পটভূমি, আর্থসামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় বাংলাদেশে আরও গভীরভাবে বিস্তৃত। সুতরাং 'শাইলক' বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হলে সেখানকার পাঠকদের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে তা জানবার কৌতূহল রইল।

উপন্যাসটি যখন লেখা হয় বিশ্বায়নের প্রকোপ তখনও বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। তথাপি তখনই আমার মনে হয়েছিল, খুব স্বল্পকালের ভেতর আমরা এমন একটা বণিক সভ্যতার গহ্বরে প্রবেশ করতে বাধ্য হব যে গহ্বর আমাদের কেবল অন্ধকার থেকে আরও গভীরতর অন্ধকারের অভ্যন্তরে ঠেলে দেবে। আমাদের শিল্প সংস্কৃতি ইতিহাস ঐতিহ্য চিন্তন মনন অতীত বর্তমান

ভবিষ্যৎ সত্তা আত্মা সহ সমগ্র জীবন বাজারের পণ্যের মতো বিশ্বায়নের বিশ্বহাটে বিক্রি হবে। আমরা বিক্রি হওয়ার আগে বিকৃত হব এবং বিক্রি হওয়ার পর চিন্তাচেতনাহীন দাসানুদাসে রূপান্তরিত হব। আমাদের ভাবনাবিহীন সেই বিচিত্র দাসানুদাস সত্তা শুধুমাত্র একটি বস্তুর জন্য জীবন উৎসর্গ করবে, তার নাম মুদ্রা; আরও স্পষ্ট করে বললে বলতে হবে, ডলার। ডলার আমাদের জীবনের প্রধান চালিকা শক্তিরূপে আবির্ভূত হবে আর আমরা তারই আরাধনায় প্রাণপাত করতে বাধ্য হব। আমরা কারা? সমগ্র পৃথিবীর মানুষেরা। যারা ডলার উৎপাদন করে তারা এবং যারা তা করতে পারে না তারাও। যাদের ডলার নেই তারা এবং একই সঙ্গে যাদের আছে তারাও! এমনই এক বীভৎস বিশ্বায়নের জাল সারা বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত হবে যা কাটা যায় না ছেঁড়া যায় না, যার ফাঁস থেকে কারও পরিত্রাণ নেই।

তের-চৌদ্দ বছর আগে আমি এমন ভাবনা ভেবেছিলাম, সেই ভাবনা থেকেই উপন্যাসটি লিখেছিলাম। আমার ভাবনা ভুল প্রমাণিত হলে আমিই সবচেয়ে বেশি খুশি হব। তার কারণ আমার সমস্ত জীবন জুড়ে আমি মানুষের, যথার্থ মানুষের সভ্যতা নির্মাণের স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতেও তেমন স্বপ্নের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না। আপনার যদি তেমন না মনে হয়, আমার কথা ভুল বলে মনে হয় তাহলে দয়া করে প্রমাণ দিন। প্রমাণ করুন যে আমরা ডলারের স্বপ্ন দেখি না অথবা দেখছি না! নিজের বুকে হাত রেখে বলুন, আপনি মুদ্রার জন্য, সামান্য কাগজের মুদ্রার জন্য আপনার মূল্যবান জীবন বাজি রাখেননি! যদি বলেন—না, আমি মুদ্রার বিনিময়ে আমার মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতে অস্বীকার করি—তাহলে একথা নিশ্চিত জেনে রাখুন, আপনার জন্য, শুধুমাত্র আপনার জন্যই আমি 'শাইলকের বাণিজ্য বিস্তার' লিখেছি। আর যদি সরলভাবে স্বীকার করেন যে কেবল মাত্র মুদ্রালাভের জন্যই আপনি জীবনপণ করেছেন; তাহলে বলব—আপনার বিপুল সম্ভাবনাময় মানবজীবনের ভয়াবহ পরিণতিকে কেন্দ্র করেই আমি আপনার মর্মান্তিক 'জীবনী' রচনা করতে বাধ্য হয়েছি; আপনার জীবনীর নাম *শাইলকের বাণিজ্য বিস্তার*।

১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১১
কোলকাতা

শাহ্‌যাদ ফিরদাউস

এক

শেষ গাড়ি।

যে কোনো মূল্যে গাড়ি ধরতেই হবে। অথচ কাউন্টারে লোক নেই। ওরা ভেবেছিল, প্যাসেঞ্জারের ঝামেলা হবে না। রাতের শেষ গাড়ির শেষ যাত্রী উঠে গেছে। আজকের মতো শান্তি। কিন্তু শেষ মুহূর্তে আর একজন এসে চিৎকার চেঁচামেচি লাগানোয় আবার কাউন্টারে ফিরে আসতে হয়। এই ফিরে আসার ব্যাপারটা বিরক্তিকর। রাত অনেক। ঘরে ফেরার তাড়া আছে, হিসেব নিকেশের পাট চুকিয়ে দেয়া হয়েছে, তারপর ফের উৎপাত। কাউন্টারের লোকটা ধীর পায়ে এসে ধীর গতিতে কাউন্টারে বসে। গাড়ি পারলে ধরবে না পারলে না তাতে কাউন্টারের কি যায় আসে? কিছুই না! কিন্তু যে বেচারা কাউন্টারের সামনে আছে তার তো অবস্থা খারাপ। গাড়ি ছাড়ার হর্ন বেজে গেছে, গাড়ি চলতে শুরু করেছে, এখনো টিকিট হাতে নেই। অথচ কাউন্টার পেরিয়ে প্লাটফর্ম, প্লাটফর্মটা কমসে কম বিশ পঁচিশ ফুট চওড়া, এতোটা দৌড়ে তবে গাড়ি ধরার ব্যাপার। তাছাড়া গাড়ি চলতে শুরু করেছে তার মানে গাড়ির সাথে সাথে খানিকটা ছুটতে হবে। আরে, এখনো টিকিট হাতে এল না! আবার চিৎকার চেঁচামেচি, অবশেষে টিকিট হাতে পাওয়া তারপর পড়িমরি ছুট্। যে কোনো মূল্যে গাড়ি ধরতেই হবে। কেন, কোথায় যাওয়া হবে? শেষ যাত্রায়?

দুই

যেতেই হবে। পর পর তিন দিন গিয়েও মলয়কে ধরা যায়নি। আগেই বেরিয়ে গেছে। মছলন্দপুর থেকে শিয়ালদা, শিয়ালদা থেকে আবার টালিগঞ্জ—সকাল সাতটার আগে পৌঁছানো সম্ভব?

সম্ভব, যদি প্রথম গাড়িটা ধরা যায়। তবে ঝঞ্ঝাট বেশি ছাড়া কম নয়। প্রথম গাড়ি স্টেশানে আসে ভোর চারটে নাগাদ। বাড়ি থেকে স্টেশান অব্দি ভ্যানরিক্সা পেলেও আধঘণ্টা, তার মানে রাত সাড়ে তিনটে। বেরুবার প্রস্তুতি নিতে অন্তত আরো আধ ঘণ্টা। তার মানে তিনটে। রাত তিনটেয় ঠিক ঠিক ঘুম ভাঙা, হাত মুখ

ধোয়া, জামা কাপড় পরা তারপর ভ্যানরিক্সা পাওয়া সোজা ব্যাপার না। এ ছাড়া এখন বৃষ্টি বাদলার দিন। ঠিক বেরুবার মুখেই যদি ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে তো হয়ে গেল! তার চেয়ে এই ভালো। এ গাড়ি ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে সেই ভোর নাগাদ শিয়ালদা পৌঁছাবে। আর যদি ভালো মানুষের মতো ঠিক সময়ে মানে মাঝরাতে পৌঁছায় তো মন্দ কি, স্টেশানে চা ফা খেয়ে ঘণ্টা দুয়েক সময় কাটাতে পারলেই হল, ভোর ভোর করে বাস ধরে ছ'টার আগেই মলয়ের বাড়ি পৌঁছে যাওয়া যাবে। কি আর করা! গরজ বড় বালাই। নইলে কি আর রাত দুপুরে বেরুতে হয়? ওকে পাওয়া দরকার। যে কোনো উপায়ে একটা পথ বের করতে হবে। দিন যে আর চলে না। দিন যদি না চলে তবে আর জীবন চলে কিভাবে? সংসার বেড়ে যাচ্ছে, ছেলে মেয়েরা বাড়ছে, তাদের চাহিদা বাড়ছে অথচ চাহিদা মেটাবার মতো অর্থ কড়ির যোগান নেই। সামান্য যেটুকু জমিজমা আছে তাতে আর কুলিয়ে উঠছে না। আগে সংসার ছোট ছিল, জিনিস পত্রের দাম কম ছিল। মোটামুটি টেনেটুনে চলে যেত। এখন টেনেটুনেও আর চলছে না। বিকল্প ব্যবস্থা না করতে পারলে সামনে বিপদ।

বাড়ির সামনে বাস রাস্তার পাশেই বিঘে খানেক জমি আছে। আজকাল গাঁ-গেরামেও নানান ব্যবসা বাণিজ্য কলকারখানা চালু হচ্ছে, বিশেষ করে বাস রাস্তার দু'পাশে। মলয় ছোটবেলার বন্ধু। টাকা পয়সা করেছে। জমিটা কিনতে উৎসাহী। একবার বলছে বাগানবাড়ি করবে। একবার বলছে হলিডে হোম করবে। আজকাল নাকি এসব হলিডেহোম-রিসোর্ট ধাঁচের হোটেল ব্যবসায় খুব রমরমা। সে যা পারিস করগে। যার এমনিতে রমরমা তার নতুন কিছুতে আরো রমরমা হবে সে আর বিচিত্র কী। এখন ভালোয় ভালোয় জমিটা বেচতে পারলে নগদ টাকাটা দিয়ে একটা ছোটখাটো কিছু শুরু করা যাবে। নইলে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে একেবারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেষ হয়ে যেতে হবে। একটু জমি ছাড়া বেচার মতো আর হাতে কিছু নেই। একটু একটু করে, একটা একটা করে সব গেছে। যাবে না কেন, খরচা বাড়ছে অথচ আয় কমছে। আয় কমছে মানে কি, পুরোপুরি শূন্য। চাকরি বাকরি নেই, ব্যবসা-বাণিজ্য নেই শুধু এক চিমটে জমির ওপর কি ছ-সাত জনের সংসার চলে? না, এভাবে চলবে না। যে ভাবে হোক বিকল্প পথের সন্ধান করতে হবে। যদি মলয় জমিটা নেয় ভালো, নইলে আর কাউকে ধরতে হবে। আসলে অন্য কেউ নেয়ার চেয়ে মলয় নিলে একটু সুবিধে আছে। ওর কাছে জমির দাম ছাড়াও ধার হিসেবে উপরি কিছু চাওয়া যাবে। আশা করা যায়, আপত্তি করবে না। ছোটবেলার বন্ধু, হাঁড়ির-নাড়ির খবর সব জানে। কিছু একটা করতে চাই শুনলে কিছু ধার কর্জ দিতে 'না' করবে না। তবে জমিটা কিনলেই এ প্রসঙ্গে বলা যাবে। নইলে আগবাড়িয়ে শুধু ধার চাওয়া যায় না। সম্পর্ক অতোটা গভীর নেই আর। যাই হোক, কাল সকালে এস্পার ওস্পার করেই তবে বাড়ি ফিরবো। হয় মলয় নেবে নইলে এদিকে যারা কিনতে চাইছে তাদের কাউকে ধরবো। কালকের মধ্যেই যা হোক কিছু একটা করে ফেলতে হবে। আর দেরি করা যাচ্ছে না। যত দেরি হচ্ছে

ততো সমস্যা বাড়ছে। শেষ কালে এমন হবে যে, জমি বেচে যা পেলাম তা খুচরো দেনা শোধ করতেই বেরিয়ে গেল। তখন কি হবে? বেচার মতো তখন চোখ কান হাত পা ছাড়া আর কিছু থাকবে না!

তিন

আরে, গাড়ি যে বেরিয়ে গেল! ছোট্, আরো জোরে, আরো জোরে! কলার খোসা ফোসা নেই তো! যা থাকে কপালে, এ গাড়ি ধরতেই হবে। আর একটু, আর একটু জোরে। আরে দেখ কাণ্ড দরোজা আটকে বেয়াক্কেলটা দাঁড়িয়ে আছে, সরবি তো! কি আশ্চর্য! উঠতে দেবে, না কি—মহামুশকিল!

ওকে প্রাণপণে ছুটতে দেখে সবাই ওর দিকে তাকায়। খানিকটা কৌতূহলে খানিকটা কৌতুকে। উঠতে পারবে তো? না, মনে হচ্ছে পারতেও পারে। আর একটু জোরে ছুটলে হয়তো পেরে যাবে। কিন্তু গাড়ি স্পিড তুলে দিয়েছে। এসব বৈদ্যুতিক ট্রেনের স্পিড তুলতে কয়েক সেকেন্ডও লাগে না। না, লোকটা বোধহয় আর পারল না। না হে, আবার এগিয়ে আসছে। হয়তো পেরে যাবে। পারবে বললে তো আর পারা যায় না। দরোজা আটকে দঁড়িয়ে আছে গোবো। বসের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত সে দরজা থেকে সরবে না।

তুবাল বসের দিকে তাকায়। চোখাচোখি হতে জিগ্যেস করে—তুলবো?

– তোলো, তবে একটু খেলিয়ে তোলো! কারো উপকার করার আগে তাকে ভালো ভাবে বুঝিয়ে দাও যে সে যা পাচ্ছে তা সুলভ নয়। তবেই সে অন্তত কিছুকাল মনে রাখবে।

– আর বোঝাতে গেলে উপকার করাই হবে না!

– তা হলে এটাই মোক্ষম সময়।

তুবাল ইঙ্গিত করলে ছুটন্ত লোকটার হাত ধরে গোবো তাকে এক ঝটকায় গাড়িতে তুলে ফেলে। ছুটতে ছুটতে লোকটা এতো ক্লান্ত যে ভালো ভাবে হাঁপাতে পর্যন্ত পারছে না। ওই অবস্থা দেখে ওদের একজন সরে গিয়ে তার বসার ব্যবস্থা করে। সে বসতে গেলে বস্ তার সামনের আসনটা দেখিয়ে সেখানে বসার ইঙ্গিত দেয়। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বসের সামনে বসল। গোবো এবার দরোজার কাছ থেকে সরে এসে ওদের সামনে দাঁড়াল।

– কফি! বসের নির্দেশ পেয়ে গোবো ফ্লাস্ক্ থেকে কফি ঢেলে লোকটার দিকে কাপটা বাড়িয়ে ধরে। লোকটা কফির কাপ হাতে নিয়ে ওদের দিকে তাকায়। মেরেছে! রাত দুপুরে কাদের পাল্লায় পড়লাম! এদের চেহারার ছবি ডাকাত গোছের না হলেও কেমন যেন অস্বাভাবিক। এরা কোন্ দেশের লোক? এতো রাতে কোথায় চলেছে? সঙ্গে দেখি কয়েকটা মেয়েও আছে, এদের কি ভয় ডর নেই? এ দেশের

অবস্থা জানে না, নাকি এরা নিজেরাই ডাকাতের দল চালায়? আজকাল গাড়িতে ছিনতাই রাহাজানি খুন কি না চলছে? তাছাড়া রোজই সব নতুন নতুন ফন্দি আবিষ্কার হচ্ছে। নতুন নতুন কায়দায় যাত্রীদের সর্বনাশ করা চলছে। কাগজে তো প্রায়ই লেখে—ডাকাত দলের লোকেরা যাত্রীদের সাথে ভাব জমিয়ে ওষুধ মেশানো চা কফি খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। তারপর ঘুমন্ত লোকের যথাসর্বস্ব লুট ক'রে কেটে পড়ে। কেউ কিছু বুঝতে পারে না, জানতে পারে না, হল্লা নেই আওয়াজ নেই, টু শব্দটি নেই, অথচ লুটের কাজ নির্বিঘ্নে সমাধা হয়। লোকটা কফির কাপ হাতে রেখে ওদের ভালোভাবে লক্ষ করে। চুমুক দেয়ার সাহস হয় না। চিনি না জানি না, কোনো কালেও এদের এলাইনের গাড়িতে দেখিনি। লোকগুলোও যেন দেখতে কেমন কেমন। শেষকালে কফি খেয়ে বিপদে না পড়ি!

লোকটা কফি হাতে নিয়ে দ্বিধা করছে বুঝে বস্ তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। তারপর গোবাকে আর এক কাপ ঢালতে ইঙ্গিত করে। গোবো কফির কাপ বাড়িয়ে দিলে হাতে নিয়ে বস্ বলল—এবার খান। চিন্তার কিছু নেই। এটা নির্ভেজাল কফি।

তবু চিন্তার কিছু থেকে যায় বই কি! কাপটা তো আর আমার নয়। আগে কিছু মিশেল দেয়া আছে কিনা কে জানে। লোকটা তবুও কফিতে চুমুক দিচ্ছে না দেখে বস্ আবার তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে তাকাল। নিজের কাপটা বাঁ হাতে রেখে ওর কাপটা ডান হাতে টেনে নিয়ে নিজেই প্রথমে চুমুক দেয়। তারপর একটু হেসে বলল—আপনি খুব সতর্ক লোক। সতর্কতা ভাল। বেশ, এবার একাপ থেকে নিশ্চিত মনে খান। আমরা চোর ডাকাত নই। ব্যবসায়ী। খান।

বাবা! ভাবার আগেই সব বুঝে ফেলে। এ তো দেখছি রীতিমত অন্তর্যামী! লোকটা বসের কাপটা হাতে নিয়ে এবার কিছুটা সাহস করেই চুমুক মারে। দারুন! এমন কফি জীবনেও ঠোঁটে ছোঁয়াইনি। সে এবার তারিয়ে তারিয়ে কফিটা শেষ করে। তৃপ্ত চোখে বসের দিকে তাকায়। কৌতূহলবশত প্রশ্ন করে—কিসের ব্যবসা আপনার?

প্রশ্নটা করেই কেমন একটু সংকোচ লাগে। এ লোক যে সে লোক নয় বোঝাই যাচ্ছে। তার পোশাক-আশাক হাবভাব মুখের ভঙ্গি ঠিক সাধারণ মানুষের মতো নয়। বেশ বড় সড় একটা ব্যাপার আছে, সত্যি বলতে কি ঠিক এই ধরনের মানুষের সঙ্গে লোকটা জীবনে কখনো বসার সুযোগ পায়নি। একেবারে সরাসরি এমন প্রশ্ন না করে একটা সম্মানজনক সম্বোধন করা উচিত ছিল। যেমন স্যার, স্যার, বললে ভাল হতো। স্যার বললে লোকে খুশি হয়। কিন্তু অন্য একটা ব্যাপার আছে, ভেতো বাঙালিরা ভেতরে ভেতরে এক ধরনের চাপা অহংকারী, সহজে কাউকে স্যার বলতে মুখে বাধে। সেক্ষেত্রে অন্তত দাদা বলা যেত। লোকটা কি ভাবছে কে জানে। কতো বড় মানুষ তাই বা কে জানে! শেষকালে আবার হিতে বিপরীত না হয়। কি দরকার ছিল এসব আলফাল প্রশ্ন করার? এ লোকের ব্যবসা দিয়ে আমার কি কাজ?

নিকুচি করি জিভের! এই জিভের জন্যই সারা জীবন পস্তে গেলাম। যেখানে যা বলার নয় ঠিক সেখানে তাই বলে বসবে।

– কেনা বেচা।

যাক, বিরক্ত হয়নি। তাহলে কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া যায়। এক গাদা লোকের সামনে বোকার মতো বসে থাকা তো আরও বোকামি। সবাই আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে আর আমি মুখ লুকোতে বাইরে তাকাবো। তাই হয় না কি? তা ছাড়া বাইরে তাকাবো কোথায়? বাইরে মানে তো অন্ধকার। ঘুটঘুটে অন্ধকারে চোখ রাখা যায় না। তার চেয়ে এই ভালো, দু পাঁচটা কথা বললে তো আর খেয়ে ফেলবে না। আমি এমন কিছু খারাপ কথাও বলছি না। সবচেয়ে বড় কথা, ওরা তো নিজেরাই আমার সাথে আলাপ জমাতে চায়। নইলে রাত দুপুরে নিজেদের কামরায় টেনে এনে কফি খাওয়াবে কেন? সে পকেট থেকে একটা সস্তা সিগারেট বের করে ধরাতে যাবে কিনা ভাবছে। এদের সামনে সিগারেট খাওয়া ঠিক হবে? আজকাল তো সিগারেট না খাওয়ার ধুম পড়ে গেছে। বস্ ইঙ্গিত করতেই গোবো এক প্যাকেট বেনসন এন্ড হেজেজ বাড়িয়ে দিল তার হাতে। বস্ লোকটার দিকে প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বলল

– এটা খান।

বাব্বা! একেবারে বেনসন! দুনিয়ার সেরা সিগারেটের একটা! আজ কার মুখ দেখে উঠেছি! সে প্যাকেটটা নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে। কেমন একটা সংকোচ বোধ হচ্ছে। নিজের পোশাক পরিচ্ছদের দিকে চোরাচোখে একবার তাকায়। গাড়ির টিমটিমে আলোতেও তার দারিদ্র্য এতো প্রকট যে সংকোচ আরো বেড়ে গেল। সংকোচ কাটাতেই সে দক্ষ হাতে প্যাকেট খুলে একটা ধরায়। তারপর প্যাকেটটা বসকে ফেরত দিতে তার দিকে বাড়িয়ে ধরে।

– আপনার কাছেই রাখুন। আমি সিগ্রেট খাইনা।

– সে কি, আপনি খান না অথচ সঙ্গে রাখেন?

– ব্যবসায়ীদের এমন অনেক কিছুই সঙ্গে রাখতে হয় যা তারা নিজেরা ভোগ করে না।

– তা অবশ্যি ঠিক।

আবার! ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে আমি কি জানি? আমার চোদ্দপুরুষের কেউ কোনো কালে ব্যবসা-বাণিজ্যের ধার ধারেনি। আর আমি কিনা পাকা ব্যবসায়ীর সামনে পাকা ব্যবসায়ীর মতো বাতেলা মারছি! এই জন্যই আমার কিছু হল না। যেখানে যা নয় সেখানে ঠিক তাই বলে ফেলবো। মাঝরাতে গরম কফি পেয়েছিস খা, দুনিয়ার সেরা সিগ্রেট পেয়েছিস খা, আরো যদি কিছু আসে বিনা বাতেলায় সাবড়ে দে। ওদের আছে, দিচ্ছে, গরিব ভুখা খেয়ে মর। অবান্তর ভাষণে দরকার কি? তাই বলে চুপচাপ থাকাও যাবে না। যা ভাবার ভাবুক, কথা বন্ধ করতে পারবো না। আরে, ভুখা নাঙ্গা হতে পারি একেবারে গবেট তো নই। পেটে তো দু-চার

লাইন হলেও বিদ্যে আছে। যে যাই বলুক, বিদ্যে থাকলে ভাষণও থাকে। বিদ্যে আর ভাষণ মা-মেয়ের মতো। একটা থাকলে আর একটা থাকবেই। চুলে চুলে সম্পর্ক। হ্যাঁ, কখনো কখনো চুলোচুলি হয়ে যেতে পারে, প্রায়ই হয়। তাই বলে একটা আর একটাকে চেপে দিতে পারবে না। যা থাকে কপালে কথা বলতেই হবে!

– তা আপনি বুঝি ট্রেডার, ম্যানুফ্যাকচারার নন?

– সব, ট্রেডার, ম্যানুফ্যাকচারার, মার্চেন্ট, ফিনান্সার, সব। দাদন, লগ্নি, মহাজনি, বন্ধকী এমন ব্যবসা নেই যা আমরা করি না।

– তবে তো আপনার বিশাল ব্যাপার।

– তা বলতে পারেন। বিরাট তো বটেই। বিশাল বলতে ঠিক কতোটা বোঝায় বলতে পারছি না তবে সারা পৃথিবী জুড়ে আমাদের কারবার চলে।

– তাই?

– তাই।

– আপনি কোন্ দেশের লোক? আপনাকে ঠিক এ দেশের লোক বলে মনে হচ্ছে না।

– সে অর্থে আমার কোনো দেশ নেই। যেখানে যখন ব্যবসা জমাট বাঁধে সেখানে তখন কিছুকাল থাকতে হয়। বিশেষ করে বড় কিছু শুরু করার আগে ঝোপ-খোপ স্বচক্ষে দেখে নিতে হয়।

– তার মানে এদেশে বড় কিছু শুরু করতে যাচ্ছেন?

– শুরু করে দিয়েছি!

– কি ধরনের?

– কেনা বেচা।

– সে তো আগেই বললেন। মানে, কি ধরনের কেনাবেচা?

– সব ধরনের। যে কোনো জিনিস কিনতে অথবা বেচতে পারি। যা কিছু আপনি ভাবতে পারেন। বলুন, যে কোনো বস্তুর নাম বলুন—আপনার লাগলে আমরা আপনার কাছে বেচবো, আপনি বেচলে আমরা কিনবো!

জমির কথাটা বলবো নাকি? বলে ফেলবো? এতো বড়ো ব্যবসায়ী, এক কথায় কিনে নিতে পারে। হয়তো মলয়ের চেয়ে আরো বড়ো হোটেল রিসোর্ট করে ফেলতে পারে। হয়তো আমাকেই দেখভাল করার দায়িত্ব দিতে পারে। বলে ফেলবো? কত টাকা চাইবো? একটু বেশি না পেলে মলয়কে ছেড়ে এদের দিয়ে লাভ কি? হাজার হলেও মলয় ছোট বেলার বন্ধু। মলয় দুহাজার করে কাঠা বলছে। বাজারে এখন সত্যি বলতে কি এর চেয়ে বেশি দর ওঠেনি। তা যদি এরা তিন হাজার করে কাঠা দেয় তবে এক ধাক্কায় কুড়ি হাজার লাভ। হ্যাঁ, ষাট সত্তর হাজার এক সাথে হাতে পেলে যা হোক কিছু একটা শুরু করা যাবে। বেশ, তবে বলেই ফেলি। একটু বেশি বলবো, চার হাজার করে কাঠা চাইবো। তারপর যেখানে গিয়ে ঠেকে। না, ঠিক এক্ষুণি না। আর একটু বাজিয়ে দেখি।

– কি হলো, কিছু একটা বলুন? যে কোনো কিছু আপনি বেচলে বলুন কিনলেও বলুন। আজ রাতে আপনার সঙ্গে একটা কারবার হয়ে যাক। জানেন তো, ব্যবসায়ীরা লাভের গন্ধ পেলে ছটফট করে ওঠে।

বস্ এবার প্রাণ খুলে হাসতে হাসতে কথা বলছে। তার হাসি দেখে একটু আশার সঞ্চার হয়। হতে পারে, এ লোককে দিয়েও উপকার হতে পারে। কে জানে, হয়তো মলয়ের কাছে যাওয়ার দরকার পড়বে না। ছোট বেলার বন্ধু, পরপর তিনদিন এতো ভোর ভোর করে গিয়েও ধরতে পারিনি অথচ কোনো তাপ-উত্তাপ নেই। দুলাইন চিঠি লিখে যা, অন্তত কাউকে কিছু বলে যা।'না কিছু বলে যায়নি।' সেই এক মুখস্ত ডায়লগ। শুনতে শুনতে ঘেন্না ধরে গেছে। তারপর সেই একই মুখস্ত কথা, চা খাবেন? যেন খাবো বললেই ঝাঁটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে, এতো অসভ্য! দুটো পয়সা হয়েছে বলে মানুষকে আর মানুষ জ্ঞান করছে না। আরে, অকারণে কোনোদিন তোর ছায়া মাড়াই না। কথায় কথায় সেদিন কথা হলো, তুই আগ্রহ দেখালি, আমারও বেচার দরকার এই তো ব্যাপার। এখন কিনলে কিনে নে, নইলে ছেড়ে দে। অসভ্যের মতো দৌড় করাচ্ছিস ক্যানো? যাকগে, এদিক থেকে যদি একটা ব্যবস্থা করতে পারি তো এইসব নতুন জানোয়ারদের কাছে আর যাওয়া লাগে না। লোকটা এবার বুদ্ধিমানের মতো হিসেব করে কথা বলতে শুরু করে— দেখুন, কেনার ক্ষমতা আমার নেই। আমি খুব সামান্য মানুষ। সামান্য এবং দরিদ্র...

– ব্যাখ্যা করার দরকার নেই। আপনি যে অর্থবান নন তা যে কেউ আপনাকে দেখে বুঝবে। আমি চাই আমাকে দিয়ে আপনার কোনো উপকার হোক। তাছাড়া আর একটা কথা, ব্যবসায়ীদের কাছে ধনী দরিদ্রের পার্থক্য নেই। বিশেষ করে যখন আপনি ব্যবসার প্রসঙ্গে ভাববেন। গরিব লোকেরা যেমন আমার খরিদ্দার বড় লোকেরাও তেমনি। উল্টো ভাবলে আমরা গরিব লোকের জিনিসও কিনি অর্থবানদের মালপত্রও কিনি। আমাদের কাছে সব সমান। আপনি নির্দ্বিধায় বলুন, কি বিক্রি করতে চান?

– তার আগে আমার আপনার পরিচয়টা ভালো ক'রে হোক। আমি একজন...সামান্য সংসারী মানুষ। ছেলে মেয়ে বাবা মাকে নিয়ে মাঝারি সংসার। তেমন বিশেষ কোনো পেশা বা জীবিকা...আমার নাম নসীব সিকান্দার।

– আমার নাম শাইলক।

– শাইলক! শাইলক কারো নাম হয়?

– হবে না কেন? হয় তার প্রমাণ আপনার সামনের এই শর্মা।

– সে তো শেক্সপীয়রের বইতে পড়েছিলাম—আর কোথাও তো শুনিনি।

– শেক্সপীয়র হাওয়া থেকে নামটা পাননি। কারো না কারো ছিল বলেই তিনি নামটা কাজে লাগিয়েছিলেন।

– তা হলে আপনি একজন ইহুদি?

– না। আমার কোন ধর্ম নেই। আমার ধর্ম ব্যবসা!

– আপনি তামাশা করছেন।

– মোটেই না। আপনি বিশ্বাস করুন, যারা যথার্থ ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসা ছাড়া আর কোন ধর্ম থাকতে পারে না।

– আপনার কথা কিন্তু হেঁয়ালির মতো শোনাচ্ছে।

– অনেক কথা আছে যা হেঁয়ালির মতো শোনায় কিন্তু সেকথা আর পাঁচটা চালু সত্যের চেয়েও বড় সত্য।

– শেক্সপীয়র শাইলক চরিত্রের মাধ্যমে গোটা ইহুদি জাতিকে হেয় করেছিলেন। তাঁর মতো বড়ো শিল্পীর এটা করা উচিত হয়নি। হয়তো তখনকার চালু ইংরেজ সেন্টিমেন্টকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে, আরো পরিষ্কার ক'রে বললে, অশিক্ষিত ইংরেজ পাবলিকের মনোরঞ্জন করতে চেয়ে তাঁকে অমন অশালীন একটা চরিত্র বানাতে হয়েছিল। খুবই অন্যায়, অত্যন্ত জঘন্য কাজ করেছিলেন একথা বলতেই হবে। শত শত বছর ধরে এই সব অসাহিত্য কুসাহিত্যকে ঢাক ঢোল পিটিয়ে ইংরেজরা মহৎ সাহিত্য বলে চালিয়েছে। প্রকারান্তরে সারা দুনিয়ায় ওরা ইহুদি-বিদ্বেষ ছড়িয়েছে। হিটলারের ইহুদি নিধনের মূলে শেক্সপীয়রের এই জঘন্য নাটকটির ভূমিকা কম নয়। নাটকটাও একটা বাজে নাটক। কোনো সাহিত্য মূল্য নেই। যুক্তিহীন ভাঁড়ামোর পর ভাঁড়ামো। ওটা নাইন টেনের ছেলেমেয়ে লিখলে মানা যায় কিন্তু শেক্সপীয়র, না, কিছুতেই মানতে পারা যায় না।

– আপনি মূল প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছেন। বোধহয় আপনি ভাবছেন, আমি ইহুদি হয়েও চেপে যাচ্ছি। না, একেবারেই না। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করুন। আগে একটা সময় ছিল, যখন ব্যবসায়ীদের কোনো একটা ধর্মবিশ্বাস থাকতো, অথবা অন্যভাবে বলা যায়—প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের ভেতর একদল লোক, জীবিকা হিসেবে কিংবা পেশা হিসেবে ব্যবসা করতো। এখন ঠিক উল্টো, একদল লোক, তারা আগে যে ধর্মেই বিশ্বাসী থাকুক না কেন ব্যবসা করতে এসে আগের ধর্মবোধ থেকে সম্পূর্ণ সরে গিয়ে নতুন ভাবে এই বাণিজ্যধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। বলতে পারেন এরা কনভার্টেড। ধর্মান্তরিত।

– চমৎকার বললেন। তাহলে এই নবদীক্ষিত কিংবা ধর্মান্তরিত লোকদের কারো কারো নাম শাইলক।

– ঠিক বলেছেন। এটা একটা উপাধি বলতে পারেন আবার নামও বলতে পারেন। অর্থাৎ একই সঙ্গে নাম এবং উপাধি। তবে উপাধি হলেও সবাই এমন উপাধি পায় তা ভাববেন না। কিংবা অন্যভাবে বলা যায়, সবাই এমন নাম নিতে পারে বা পেতে পারে তাও নয়। এর জন্যে একটা পর্যায়ে উঠতে হবে। অর্থাৎ খুব বড় মাপের ব্যবসায়ী না হলে তাদের শাইলক বলা চলে না। ছোট ব্যবসায়ীদের বরঞ্চ শাইলকের চর, চেলা অথবা অনুগৃহীত বলতে পারেন। যাইহোক, মূল প্রসঙ্গে আসি—আপনি কি বিক্রি করতে চান, বলুন?

হ্যাঁ, এতোক্ষণে ঠিক সময় এসে গেছে। লোকটা বার বার কেনার কথা তুলছে। তার মানে ষোল আনা আগ্রহ তৈরি হয়েছে। এবার টুক করে ছুঁড়ে দিলে গিলে নেবে। দামটাও আশা করি ভালোই পাওয়া যাবে। ইতোমধ্যে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে আমি একেবারে আনপড় নই। রীতিমতো শেক্সপীয়রের সমালোচনা করে ছাড়লাম। আশাকরি এখন থেকে একটু অন্য চোখে দেখবে। গরিব হতে পারি কিন্তু নির্বোধ নই। উহ্! নিজেকে বুদ্ধিমান প্রমাণ করার কি প্রাণান্তকর চেষ্টা! আমার বোধ বুদ্ধি দিয়ে এ লোকের কি হবে? সে চায় ব্যবসা। তার যদি পোষায় আমার জমি কিনবে নইলে না। আমার জ্ঞানবুদ্ধি পাণ্ডিত্যে তার কিছুই আসে যায় না। যত্তোসব! আসল কথাটা না বলে শুধু ভ্যানতাড়া! যাক্ এবার বলেই ফেলি। এখনই? না, আর একটু পরে। মানে দুচারটে অন্য কথার মধ্যেই টুক করে জমির কথাটা ছুঁড়ে দেবো। তার আগে ছোট্ট করে একটু ভূমিকা দিয়ে নিই। আরে, সবাই কি আর নির্লজ্জ ব্যবসায়ী না কি! ঠেকায় পড়ে জমি বেচতে হচ্ছে, এটা বলতে কি খুব ভালো লাগে? বিশেষত যার নাক কান এখনো কাটা যায়নি, ছিটে ফোঁটা হলেও সম্ভ্রমবোধ আছে! আরে বলছি, বলছি, এখনই বলে ফেলবো। তার আগে একটু অন্য দিকে ঘুরে আসি।

সিকান্দার তখনো পুরো সংকোচ কাটিয়ে জমির কথাটা তুলতে পারছে না। সে শাইলকের কথার পিঠে কথা জুড়ে বলল—বিক্রি? তা অতীত ছাড়া আমার আর তেমন কিইবা আছে...

– আমরা আপনার অতীত কিনতে পারি!

– কি বলছেন!

– বলুন, আপনার অতীতের দাম কতো?

– আপনি তামাশা করছেন।

– না। আপনি বলুন, আপনার অতীতের দাম কতো? আমি এক্ষুনি, এখানেই আপনার দাম মিটিয়ে দেবো!

– আশ্চর্য!

– কিছুই আশ্চর্য নয় মিস্টার সিকান্দার। আপনি আপনার অতীতের দাম বলুন।

– আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

– কেন বুঝতে পারছেন না?

– আমার অতীত কিনে আপনি কি করবেন?

– ব্যবসা করবো!

– বিস্ময়কর...

– আপনি অকারণে পরপর বিস্মিত হয়েই চলেছেন। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। অতীত নিয়েও ব্যবসা করা চলে।

– কি ব্যবসা?

– কেনা-বেচা?

– মানে, আমার অতীত আপনি কার কাছে, কিভাবে বেচবেন?

– সে সব আমার ব্যাপার। আপনি দাম বলুন।

– কিন্তু ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকছে না...

– কেন ঢুকবে না, খুবই সোজা ব্যাপার। লোকেরা রক্ত বিক্রি করে, জানেন?

– হ্যাঁ, সে তো আকছার করে। আগে আরো বেশি করতো। এখন বোধহয় একটু কমে গেছে।

– এখন লোকেরা কিডনি বেচে, চোখ বেচে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গও বেচে, জানেন?

– হ্যাঁ, তা শুনেছি কিন্তু এসব জিনিস তো চোখে দেখা যায়, একটা ব্যবহারিক মূল্যও আছে, অতীতের কি এমন ব্যবহারিক মূল্য থাকতে পারে?

– ব্যবহার করলেই ব্যবহারিক মূল্য তৈরি হয়। ব্যবসায়ীদের কাজ কোনো নতুন জিনিসের ব্যবহার শেখানো। এছাড়া দেখা না দেখার প্রসঙ্গে বলি

– যা কিছু আপনি দেখেন তাই শুধু বিক্রি হয় আর যা কিছু দেখেন না তা কেনেন না এমন নয়?

– যেমন?

– যেমন, কোনো কোনো অসুখে রুগীকে অক্সিজেন দিতে হয়। অক্সিজেন আপনি দেখতে পারেন?

– তা ঠিক কিন্তু তবু তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বোঝা যায়, রুগী সুস্থ হয়ে ওঠে— একটা ব্যবহারিক মূল্য তো পেতেই হবে...

– চাঁদের মাটির কি ব্যবহারিক মূল্য আছে?

– তা অবশ্যি নেই।

– বার্লিনের দেয়াল ভাঙা ইটের টুকরোর কি ব্যবহারিক মূল্য আছে?

– তা নেই। কিন্তু স্মৃতি বলুন, এর পেছনের ইতিহাস বলুন...

– সে কথা বললে বলবো, আপনার স্মৃতি আছে, আপনারও ইতিহাস আছে— আমরা আপনার সমস্ত স্মৃতি সমস্ত ইতিহাস কিনে নিতে চাই!

– কিন্তু আমার মতো নগণ্য মানুষের ইতিহাস-স্মৃতি কোথায় বেচবেন, কে কিনবে?

– আমার কাজ নিয়েই আপনি বেশি ভাবছেন। কোথায় বেচবো সেটা সম্পূর্ণ আমার ব্যাপার, সেটাই আমার ব্যবসায়িক দক্ষতা, আমার যোগাযোগ বিশ্বব্যাপী, বিস্তৃত আমার নিজস্ব নেটওয়ার্কস। আপনি আমার অতীত কিনে বেচতে পারবেন না, আমি আপনারটা কিনে পারবো। কারণ আপনার বেচার ক্ষমতা যোগাযোগ এবং নেটওয়ার্কস নেই, আমার আছে। আমার আছে বলেই আমি কিনতে পারি বেচতেও পারি।

– যাই বলুন, অবিশ্বাস্য ব্যাপার মনে হচ্ছে...

– সেটা হতে পারে। তার কারণ—এই ব্যবসাটা এখনো খুব বড়ো স্কেলে চালু হয়নি। দুএক বছর পর দেখবেন এটা জলভাতের মতো সহজ লাগছে। আচ্ছা, চাঁদে জমি বিক্রি হচ্ছে, লোকেরা কিনছে, চাঁদে হিলটন কোম্পানি হোটেল বানাচ্ছে এবং লোকেরা অগ্রিম ঘর বুক করছে, জানেন?

– আমি মফস্বলে থাকি। পুরো ব্যাপার জানিনে। তবে কাগজে দেখেছি। লোকেরাও মাঝে মাঝে বলাবলি করে। সত্যি কথা কি, আমি এখনো এই ব্যাপারটা ভালো বুঝে উঠতে পারিনি। চাঁদে কার জমি কে বিক্রি করছে? কার জমিতে কে হোটেল বানাচ্ছে? তারা হোটেল বানাবার অনুমতি কোত্থেকে পায়। কে তাদের জমির দখল দিল? কারা সেখানে থাকবে? কবে, কতো শতাব্দী পরে?

– এক সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করে বসলেন। আমি সহজ কথায় আপনাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছি—মালিকানার প্রধান শর্ত—দখল করতে পারা এবং দখলে রাখতে পারা। যারা চাঁদ দখল করেছে এবং দখলে রাখছে তারাই চাঁদের মালিক। তারাই চাঁদের জমি বিক্রি করছে। যারা ওখানে হোটেল বানাচ্ছে তারা মালিকদের সঙ্গে বোঝাপড়া করেই করছে। যারা হোটেল বুক করছে বা জমি কিনছে তারা নিশ্চিন্ত মনে কিনছে। কারণ যার জিনিস সে বিক্রি করলে কিনতে বাধা নেই। আর কবে চাঁদে হোটেল হবে কিংবা বাড়ি হবে তবে সেখানে বেড়াতে যাবো ততোদিনে বেঁচে থাকবো কিনা এসব প্রশ্ন অবান্তর। অবান্তর এই জন্যে, মালিকানা শুধু নিজের জন্যে নয় ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারীদের জন্যেও বটে। এই যেমন ধরুন আপনাদের কলকাতার যতোটা রিপোর্ট আমি পেয়েছি—এখানকার সল্টলেক কিংবা তার আগের বালিগঞ্জ, নিউ আলীপুর, যোধপুর পার্ক এলাকা যখন বিক্রিবাটা হয় তখন নাকি দিনের বেলাতেও লোকে ঢুকতে সাহস করতো না। সল্টলেকে নাকি এখনো রাতে শেয়ালের ডাকে ঘুমোনো যায় না। আরো কাছের ঘটনা আপনাদের ইস্টার্ন বাইপাস। ওখানে যারা এখন জমি কিনছে তারা কি বোকা? অথচ দেখুন, সন্ধ্যের পর ওখানে নাকি চুরি ছিনতাই ডাকাতি ধর্ষণ খুন সবই চলে। চলে, চলছে, এটা সত্যি। আবার জনবসতি বেড়ে গেলে এসব কমে যাবে, এও সত্যি। যারা দূরদর্শী তারা এখনকার জন্যে কিনছে না। যখন জায়গাটা জমে যাবে, বিপদ আপদ কমে গিয়ে নতুন সুখের বসতি হয়ে উঠবে তখন যাবে। চাঁদের ব্যাপারেও তাই। যারা চাঁদে জমি কিনছে তারা থাকার জায়গার অভাব আছে বলে কিনছে না, ভবিষ্যতের জন্যে কিনছে। এক কথায় ভবিষ্যৎ কিনছে! এটা সবাই পারে না। যার ক্ষমতা আছে সে পারে। যে টাকা বসিয়ে রাখতে পারে দু দশ বছর এমনকি বিশ পঞ্চাশ বছর, যার টাকা বসিয়ে রাখার ক্ষমতা আছে তার রসিয়ে রসিয়ে ভবিষ্যৎ কেনার যোগ্যতা তৈরি হয়েছে। যাকগে, এখন আপনার অতীতের দাম বলুন। আমি আপনার অতীত কিনতে আগ্রহী।

লোকটা যা বলছে তার ভেতর যুক্তি আছে। কিন্তু পাগল ছাগলের কথার ভেতরেও অনেক সময় যুক্তি থাকে। পয়সাঅলা পাগল নয় তো! টাকা আছে বলে

যা খুশি করছে যা ইচ্ছে বলছে, তাই যদি হয়? হলে হোক, আমার কি? আমি যদি তালে গোলে কিছু পয়সা পেয়ে যাই, মন্দ কি? আমার জমি বেচতে হল না অথচ ফোকটে জমির দাম পেয়ে গেলাম। খারাপ কি? আমি তো আর সমাজ সংস্কারক নই, সাধু সন্ন্যাসীও নই। কেউ যদি পাগলামিতে টাকা নষ্ট করতে চায়, নষ্ট করে আনন্দ পায় তাতে আমার কি বলার থাকতে পারে? তাছাড়া এতোগুলো লোক, মহিলা, পুরুষ মিলিয়ে বারো চোদ্দ জন তো এখানেই দেখা যাচ্ছে। ওপাশে আরো আছে কি না কে জানে? এতোগুলো পয়সাঅলা পাগল একসঙ্গে দলবেঁধে পাগলামি করতে বেরিয়েছে? না, এটাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাহলে আসল বিষয়টা কি? কেমন যেন মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে মনে হয়। অতীত কিনে অতীত বেচা? বাপের জন্মেও এমন কথা শুনিনি। অবশ্যি আমি আর কতোটুকু শুনেছি? থাকি মফস্বলে, সেখানে সব আমার মতো পণ্ডিতের আস্তানা। ভালো করে ইংরেজি কাগজ পড়তে গেলেই গায়ে ঘাম ছোটে। দুনিয়ার হালচাল আমার জানার কথা নয়। আচ্ছা, সত্যি যদি এ লোক আমার অতীত কিনতে চায়—সত্যিই চায় মনে হচ্ছে, বার বার ঘুরে ঘুরে একই প্রসঙ্গে ফিরে আসছে, তো দামটা কি বলবো? এই উদ্ভট বস্তুর কি দাম ধরা যায়? একটা কিছু তো বলতে হবে। কতো বলব? পঞ্চাশ হাজার? ধুর! এতো টাকা দেবে? না, পঁচিশ হাজার বলি। পঁচিশ যদি ফোকটে মেলে তারপর জমিতে যদি চল্লিশ হয় তবে আর চিন্তা নেই। কারো কাছে আর ধার দেনার ঝামেলা থাকবে না। তবে পঁচিশই বলে দিই? হ্যাঁ, তাই সই।

– কি হল বলুন?

– দেখুন আমি এসব তো কেনাবেচা করিনি, আপনি একটা ধারণা দিলে ভালো হয় না।

– আমি বলবো? বেশ,হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলারস্!

– মানে?

– এক লক্ষ ডলার!

– কি বলছেন!

– কেন কম মনে হচ্ছে? বেশ, টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলারস্!

– বলছেন কি? আশি লক্ষ টাকা!

– কম মনে হচ্ছে? বেশ, আপনার কারেন্সিতে পুরো ফিগার করে দিচ্ছি–

এক কোটি! বলুন, রাজি? তাহলে এক্ষুনি কাগজপত্র তৈরি করে ফেলি।

– এখানেই?

– হ্যাঁ, অবশ্যই। জেসিকা! কাগজপত্র তৈরি কর!

সিকান্দার হাঁ হয়ে গেল। তার যেন আর রা কাড়ার ক্ষমতা নেই। এ কি শুনলাম! এক কোটি টাকা! আমার ফুটোফাটা অতীতের দাম এক কোটি? আমার অতীতে আছেটা কি মূলো? ভালো করে বলতে বললে দেড় মিনিটও লাগবে না। একদিন কুক্ষণে জন্মালাম, চার পাঁচটা ভাইবোনের সাথে ধাক্কাগুঁতো খেয়ে বড়

হলাম। স্কুল-কলেজে কিছুদিন ঢুঁ মারলাম। চাকরি-বাকরির তালে কিছুদিন জুতোর শুকতলা ভোগে দিলাম। অবশেষে বাপের তালে পড়ে বিয়ে করলাম এবং যথারীতি তিন তিন খানা বাচ্চার জন্ম দিলাম এবং সবশেষে বাচ্চাদের মানুষ করতে গিয়ে রাত দুপুরে হাটে মাঠে ঘুরছি—এই তো আমার অতীত। এর মূল্য এক কোটি? হোক, তাই হোক, যো ওয়াপ্‌সে আতা হ্যায় উও হালাল হ্যায়!

জেসিকা তার পাশের ব্রিফকেসটা টেনে খুলে ফেলল। ব্রিফকেস নয়, কম্পিউটার! কম্পিউটার খুলে কোলের উপর রেখেই টাইপ শুরু করে দিল। হঠাৎ থেমে মধুর কণ্ঠে জিগ্যেস করে—ইওর নেম? আই মিন...মানে আপনার নাম, বাবার নাম, ঠিকানা, পুলিশ স্টেশান, বয়স, পেশা এসব এই কাগজে লিখে দিন। পিনকোড লিখবেন।

সিকান্দার কাগজটা টেনে খস খস করে লেখে। হাতটা যেন একটু কাঁপছে। উত্তেজনায়? তা হবে হয়তো। উত্তেজনা হবারই কথা। কাজটা ভালো করছি না মন্দ? পাগল লোকটাকে ফাঁকি দিয়ে এতোগুলো টাকা হাতিয়ে নিচ্ছি, এটা কি ঠিক হচ্ছে? নাকি পাগলা আমাকে ফাঁকি দিয়ে বড় সড় কোনো ঝামেলায় ফেলছে? এমন কেনা-বেচা করতে হচ্ছে যার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। যা হবার হবে! টাকা হাতে থাকলে ঝামেলা ঝক্কি সামলে নেয়া কোনো ব্যাপারই নয়। তাছাড়া টাকা কামাতে গেলে গায়ে একটু আঁচ লাগবে না, টাকা বাড়ি হেঁটে আসবে এতো সস্তা নয়। যা হবার হোক, কিন্তু টাকা আসুক। এক কোটি টাকা! জীবন পুরো পাল্টে ফেলবো। জীবনটাকে এবার জীবনের মতো ভোগ করতে হবে। জীবন একটাই, এই একটা জীবন ঠিক বাঘের মতো ভোগ করা চাই! বাঘের মতো, সিংহের মতো! এখন যা চলছে এর নাম জীবন? ছোঃ! সিকান্দার কাগজটা জেসিকাকে ফেরত দিয়ে শাইলকের দিকে তাকায়। শাইলক ওর দিকেই তাকিয়ে ছিল। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বলল—টাকা ক্যাশ নেবেন না চেকে? আপনি চাইলে এখনই পেমেন্ট ক'রে দিতে পারি।

– এখানেই?

– হ্যাঁ এখানেই। তবে একটা অসুবিধে হতে পারে। আমার কাছে আপনার দেশের কারেন্সিতে অতো টাকা হবে না। আপনাকে ডলার নিতে হবে। তাই নেবেন?

– আপনি অতো টাকা সঙ্গে নিয়ে এতো রাতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন?

শাইলক মৃদু হাসল। হাসতে হাসতে মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল—এতো রাতে শুধু শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছি না। ব্যবসার কাজে ঘুরছি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটা দেশে কাজ সেরে বাংলাদেশ, বাংলাদেশ থেকে এখন কলকাতায় ফিরছি। যেখানে টাকা ঢালবো সেখানকার মাটি চিনবো না তা হয় না। আমার এই হাঁটাপথে ভ্রমণের, মানে গাড়িতে ঘোরার অন্য উদ্দেশ্য আছে, এই গরিব দেশগুলোর নাড়ির মূল স্পন্দনটা ধরা। এখানকার জমি কতোটা নরম, শেকড় ধরে টান দিলে কতোটা উঠে আসবে, কতোটা উঠিয়ে কতোটা নতুন গাছ পোঁতা যাবে তার একটা হিসেব

নিতে চাই। যাই হোক সেসব আমার ব্যাপার। আপনি এসব ঠিক বুঝতে পারবেন না। বোঝার তেমন দরকারও নেই। আর এতো টাকা সঙ্গে নিয়ে এতো রাতে ঘুরে বেড়াবার কথা যদি বলেন তাহলে বলতে হয়, আপনি যতো টাকা ভাবছেন তার চেয়ে বহুগুণ টাকা আমার সঙ্গে আছে, থাকে। অতো টাকা সঙ্গে রাখতে হলে যা যা করা দরকার মানে যেটুকু সতর্ক থাকতে হয় সে টুকু সতর্ক আমি সব সময় থাকি। আপনার পেছনে সামনে ডানে বাঁয়ে যাদের দেখছেন ওরা সব আমার লোক। সবাই সশস্ত্র। অত্যাধুনিভাবে সশস্ত্র। ওরা যে কোনো দেশের ছোটখাটো একটা সেনাবাহিনীর সঙ্গে টক্কর দেয়ার ক্ষমতা রাখে। তাছাড়া যখন আমি যেসব দেশে যাই সেসব দেশের সরকারি অনুমতির সঙ্গে আমাকে বিশেষ নিরাপত্তা দেয়ার প্রতিশ্রুতি থাকে। অর্থাৎ কোনো দেশে ঢোকার জন্যে যে অনুমতির দরকার হয় আমার ক্ষেত্রে আসলে তা সেই সরকারের করুণ আবেদন। পৃথিবীর প্রতিটি দেশের সরকার তার দেশের নাড়ি-নক্ষত্র স্বেচ্ছায় দেখাবার জন্যে আমার কাছে আবেদন করে। কারণ আমার অফুরন্ত টাকা আছে, মানে ডলার আছে। আর পৃথিবীর প্রতিটি দেশের প্রত্যেক সরকারের ডলার দরকার। যার বেশি আছে তার বেশিটা নিরাপদে গচ্ছিত রাখার জন্যে আরো বেশি দরকার। তাই তাদের আমাকে দরকার। আর আমারও ডলার বাড়াতে গেলে আপনার দেশের নরম মাটির মতো মাটি চাই। আপনার দেশের কোমল সরকারের মতো নতজানু সরকার চাই। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, আমাকে রাত-বিরেতে ঘুরতে হয় আমার দরকারে, আর আপনার সরকার আমার ঘোরার বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দেয় তার দরকারে। যাক, এবার বলুন, আপনার টাকা কীভাবে নেবেন?

– অর্ধেক চেকে, অর্ধেক ক্যাশে।

– বেশ তো, ক্যাশটা ডলারে দিই?

– ডলার ভাঙাবো কোথায়? আমাদের এখানে আমার মতো লোক এতো ডলার ভাঙাতে গেলে বিরাট ঝামেলায় পড়ে যেতে পারি।

– তাহলে এক কাজ করুন, আমার সাথে কলকাতায় চলুন। কাল সকালে আপনাকে ভারতীয় টাকায় পেমেন্ট করবো। ঠিক আছে?

– ঠিক আছে।

– আচ্ছা, একটা কাজ করুন...আপনি ফিল করুন যে আপনার হাতে টাকা আছে, আপনি এখন মানিডম্যান। আন্তোনিও! তুমি ওঁকে হান্ড্রেড থাউজেন্ড ইন্ডিয়ান রুপি দিয়ে দাও। এক লাখ টাকা আপনি নিজের কাছে রাখুন। নইলে আপনার মনে হতে পারে সবটাই কাগুজে ব্যাপার, আপনার আশঙ্কা, দুশ্চিন্তা, সন্দেহ বাড়বে। তারচেয়ে এই ভালো, কিছু টাকা পকেটে রাখুন।

– আমার কাছে হান্ড্রেড থাউজেন্ড ইন্ডিয়ান রুপি নেই। আন্তোনিও তার ব্রিফকেস খুলে একটা পাঁচশ টাকার বান্ডিল বের করলো।

– পোরশিয়া! তোমার কাছে হবে কিনা দেখ।

শাইলকের নির্দেশে পোরশিয়া ব্রিফকেস খুলে আর একটা পাঁচশ টাকার বান্ডিল বের করে তার হাতে দিল। দুটো বান্ডিল একসঙ্গে সিকান্দারকে দিয়ে শাইলক বলল—টাকাটা পকেটে রাখুন, ভালো লাগবে। টাকা মানে শুধু কাগজ নয়, মানুষের স্বপ্ন, বাসনা, কল্পনা। যা পাইনি তার অনেকটাই হাতের মুঠোয় পাওয়া। আপনি টাকার বান্ডিলে আলতোভাবে হাত বুলোন দেখবেন অদ্ভুত একটা সুখের অনুভূতি জাগছে, এই সুখ শুধু মানসিক নয়, অনেকটা শারীরিক। দেখবেন কিছুক্ষণ হাত বুলোবার পর আপনার শারীরিক শিহরণ জাগবে, উত্তেজনা আসবে, এক ধরনের চরম আনন্দের দিকে আপনার শরীর আপনার মনকে এগিয়ে নেবে। এইজন্যে মানুষ টাকা ভালোবাসে। যত বেশি টাকা আপনার হাতে থাকবে, মানে আয়ত্তে থাকবে তত বেশি সুখের অনুভূতি জাগবে, তত বেশি শারীরিক উত্তেজনা আসবে তত বেশি চরম আনন্দের কাছাকাছি পৌঁছে যাবেন। এই জন্যে আমার বেশি টাকা চাই, আরো বেশি, আরো বেশি, অফুরন্ত–পৃথিবীর সব টাকা, সব সম্পদ সব আনন্দ আমার চাই! বাসানিও! ড্রিংকস!

সিকান্দার টাকাটা পকেটে পুরে বেশ তৃপ্ত মুখে বেনসনের প্যাকেট থেকে আর একটা সিগ্রেট বের করে ধরায়। তারপর তারিয়ে তারিয়ে টানতে টানতে বলে—

আপনার লোকদের নামও দেখছি আপনার নামের মতোন পুরোপুরি শেক্সপীয়ারিয়ান।

শাইলক মদের পাত্রে চুমুক মেরে গাঢ় স্বরে বলে—তা মিথ্যে বলেননি। তবে নামের মিল থাকলেও কামে ও দামে তফাৎ আছে। যেমন, শেক্সপীয়রের শাইলক ইহুদি, আমি তা নই। শেক্সপীয়রের শাইলক ক্রূর প্রতিহিংসাপরায়ণ ঈর্ষাকাতর অর্থবান নিষ্ঠুর এবং নির্বোধ। আমি নির্বোধ নই। শেক্সপীয়রের শাইলক তার প্রতিপক্ষের কাছে অর্থাৎ আন্তোনিওর কাছে পরাস্ত হয়। আমি কারো কাছে পরাস্ত হবো না। শেক্সপীয়রের শাইলক পোরশিয়ার মতো এক বালিকার বুদ্ধিতে ধরাশয়ী হয়ে পড়ে। আমি হই না। এরা, অর্থাৎ পোরশিয়া বাসানিও লরেনজো গোবো আন্তোনিও এমনকি নিজের মেয়ে জেসিকাও শাইলকের বিরুদ্ধতা করেছিল, এরাই ছিল তার প্রধান প্রতিপক্ষ, এদের জন্যেই তার পতন ঘটে। আমার ক্ষেত্রে তেমন ঘটনা ঘটবে না। কারণ সমস্ত প্রতিপক্ষই আমার বেতনভুক্ত কর্মচারী অথবা আমার কাছে ঋণী। আমার মেয়ে জেসিকা আমার বিরুদ্ধতা করবে না। কারণ, সে তার যে কোনো কর্মচারীকে বিয়ে করলেও আমার কোনো আপত্তি নেই। আপত্তি নেই তার কারণ, জেসিকার সাথে বিয়ের আগেও তারা যেমন আমার পোষ্য বিয়ের পরেও তেমনি পোষ্য থাকবে। কোনো বড় মানুষের বন্ধু থাকে না। জেসিকারও থাকবে না। স্বামী হবে তার বেতনভুক কর্মচারী অথবা রক্ষিত, আত্মীয় স্বজন হবে তার অনুগ্রহপ্রার্থী। তথাকথিত বন্ধুরা হবে বিদূষক, ভাঁড়, মোসাহেব। সে থাকবে সম্রাজ্ঞীর মতো স্বরাজ্যে স্বরাট। এই স্বপ্নের জীবন ছেড়ে সে আমার বিরুদ্ধতা

করার দরকার বোধ করবে না। শেক্সপীয়রের শাইলকের ধর্ম ছিল, তাই খ্রিস্টান বিধর্মীর সঙ্গে মেয়ের প্রণয়ে তার ধর্মীয় অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়। আমার ধর্ম নেই তাই সেরকম সমস্যাও নেই। মোদ্দা কথা, শেক্সপীয়রের শাইলকের লোকবলের অভাব ছিল, সংখ্যালঘু হিসেবে তার নিরাপত্তার সংকট ছিল, উদ্বাস্তু বলে পায়ের তলার মাটি অশক্ত ছিল, সংস্কার-কুসংস্কারের দুর্বলতা ছিল, এবং শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ছিল তাই তার পরাজয় ছিল অবশ্যম্ভাবী। আমার ধর্ম নেই, সংস্কার নেই, নিরাপত্তার সংকট নেই, লোকবলের অভাব নেই, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, আমার কোনো প্রতিপক্ষ নেই। আমার সমস্ত প্রতিপক্ষকে ডলার ধার দিয়ে তাদের কোমর ভেঙে দিয়েছি। তাদের বিরোধিতা করার ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছি। তাই কখনো আমার পরাজয় ঘটবে না। ঘটতে পারে না। অবশ্যম্ভাবী আমার বিজয়। আপনারা যাকে খোদা, বিধাতা বা ঈশ্বর বলেন—আমি তাই! অমনিপ্রেজেন্ট, অমনিসায়েন্ট, অমনিপোটেন্ট!

চার

স্বপ্নের ঘুম ভাঙাতো সিকান্দারের একটু দেরি হলো। তা হোক, এখন দেরিতে ঘুম ভাঙলেও কোনো অসুবিধে নেই। তাড়া নেই। অর্থ রোজগারের উদ্বেগ নেই। এখন নিরাপদ তন্দ্রায় সারাদিন কাটিয়ে দিলেও কারো কিছু বলার থাকবে না। সারা জীবনের রোজগার একটি মাত্র রাতের একটি মাত্র প্রহরে করা হয়ে গেছে। তবু শারীরিক নিয়মে ঘুম ভাঙে, শারীরিক কারণেই উঠে বসতে হয়। বেলা প্রায় দশটা। পুরনো প্রায় অথর্ব, জঘন্য দর্শন হাতঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফেরায়। আর এসব পুরনো অচল জিনিস চলবে না। আজ থেকে সব পাল্টে যাবে। বাড়ির সমস্ত আসবাব, বাড়ির চারপাশ, বাড়ি, সব পাল্টে যাবে। সব কিছু নতুন তকতকে ঝকঝকে হবে। পুরো জীবনটাই ঝকঝকে তকতকে নতুন করে নিতে হবে। টাকাটা আছে তো? দরিদ্র লোকের স্বভাববশত সে প্যান্টের দুপকেটে হাত ঢুকিয়ে টাকার বান্ডিল দুটো বের করে। না ভয়ের কিছু নেই, সব ঠিক আছে। স্বপ্নের মতো রাতটা স্বপ্ন নয়, বাস্তব পুরোপুরি অর্থময়।

সিকান্দার হাত মুখ ধুয়ে নিজেকে একটু গোছ গাছ করে। বাথরুম থেকে ফিরে এসেই দেখে চা জল খাবার প্রস্তুত। ঘন করে মাখন লাগানো পাউরুটি, ডিম, দুধ, কলা, আপেলের টুকরো, আঙুর, কাজু বাদাম, একটা দুধ সাদা কি যেন! কেক? হয়তো বা জন্মেও এ জিনিস দেখিনি! জলখাবার যদি এই হয় তো আসল খাবারের দাপট কি হতে পারে? এতো সব খাওয়া একজন লোকের কম্ম নয়। ব্যাগে ঢুকাবো? ধুর! ইতরামো! পকেটে এখন কড়কড়ে এক লাখ। একটু পরেই এক কোটি হাতে আসবে। সামান্য জল খাবার ব্যাগে পুরতে হবে? ছোটলোক আর

কাকে বলে! না, ওই ছেলেমেয়ে গুলোর কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তা মনে পড়ুক। আজ সন্ধ্যার পর ওরা ভুরিভোজ খাবে। প্রতিদিন খাবে। আর কোনো চিন্তা নেই, কোনো দুশ্চিন্তা নেই। মলয়! তোকে আজ একটু দেখাবো! একটু না দেখিয়ে পারবো না। টাকা থাকলে একটু দেখবার ব্যাপার এসেই পড়ে, কিছু মনে করিস না ভাই। ধান্দাবাজি করে এ পর্যন্ত কতো কামিয়েছিস? পাঁচ লাখ, দশ লাখ, বিশ লাখ? তার বেশি কিছুতেই না। আর এদিকে দেখ, এক রাতে এক কোটি! আজ একটু বোঝাপড়া হবেরে, মলয়! একটু দেখাদেখি হতেই হবে!

সেই দুধসাদা কেকের মতো কি যেন জিনিসটা আগে মুখে নিয়ে কামড় মারার সাথে সাথে গলে গলে। আহা, মধু! মধু কিরে, মধুর বাপ! এসব জিনিস যারা খায় তাদের চেহারা কোমল না হয়ে পারে! তবে চেহারা কোমল হলেও মনটা বোধ হয় সেই অনুপাতে কঠিন হবে? তাই তো মনে হয়। সমাজ বিজ্ঞান তো তাই বলে। ফলিত পদার্থবিজ্ঞান কি বলে? বোধ হয় সমাজ বিজ্ঞানের বাইরে কিছু বলবে না। ট্রে-টার এক পাশে একটা সাদা খাম। মাঝখানে ছাপানো নাম—মিষ্টার নসীব সিকান্দার। এতো তাড়াতাড়ি ছাপানো যায়? ও হ্যাঁ, আজকাল তো কিসব টাইপ মেশিন বেরিয়েছে, কম্পিউটার টাইপ বোধ হয়। একবারে ছাপার বাবা! খামের ওপরে কোম্পানির উড়ন্ত ঈগলের লোগো। ঈগল? বাজপাখি? ভালো! ঈগলের ডানপাশে চমৎকার টাইপে লেখা—শাইলক অ্যান্ড সিকোফ্যান্ট্স! মানেটা কি যেন, কি যেন...ও হ্যাঁ, মনে পড়ছে—স্তাবক, হীনতম স্তাবক, চাকর বাকর আর কি! কি আশ্চর্য! এমনতর কোম্পানির নাম কেউ ভাবতে পারে! এ যে চূড়ান্ত দম্ভ, অসভ্যের মতো দম্ভের প্রকাশ। টাকা থাকলেই দম্ভ থাকে। যার যতো বেশি টাকা তার ততো বেশি ক্ষমতা তার ততো বেশি দম্ভ। মলয়, যে কিনা এখনো দু পাঁচ লাখ টাকাও এক সাথে জড়ো করতে পারেনি—ছোট বেলার বন্ধু, পর পর তিন দিন এতো দূরে থেকে এসেও দেখা পাইনি অথচ কোনো তাপ উত্তাপ নেই। ভাবটা এমন, গরজ যখন তোর তোকে তো আসতেই হবে। আমার যখন অতোটা গরজ নেই আমি তো বেরিয়ে যেতেই পারি। আমি যতোবার বাইরে থাকবো তোকে ততোবার ছুটে ছুটে এখানে আসতে হবে। তোর জমির দামটাও ততো কমবে। তোর এখন আর গতি নেই, তখন তোকে একটু খেলাতে দোষ কোথায়? খেলা দেখাচ্ছি! আজ খেলাটা আমিই দেখাবো!

সিকান্দার খামটা খুলে পড়ল। শাইলক দেখা করতে লিখেছে। বেশ, যাচ্ছি। না, লোকটা দাম্ভিক হলেও প্রোফেশনাল। এতো ঝামেলার ভেতরেও ঠিক আমার কথা মনে রেখেছে। ব্যবসা করতে গেলে অবিশ্যি ছোট বড় সবাইকে মনে রাখতে হয়। তবে সবাই রাখে না। অন্তত এই ভদ্রতাবোধ সবার থাকে না। ভদ্রতাবোধ? নয় কেন? অবশ্যই। যার যেটুকু আছে তা স্বীকার করতেই হবে।

সিকান্দার ঝোলাব্যাগটা কাঁধে নিয়ে দরোজা খুলে বাইরে আসতেই দেখে একজন তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে অথচ ডাকেনি। মানে

ডাকতে সাহস করেনি। তার মানে ভি-আই-পি হয়ে গেলাম নাকি! নয় কেন, কোটিপতি মানেই তো-ভি-আই-পি। অবশ্যই!

বিশাল চেম্বারে ঢুকতেই মৃদু হেসে স্বাগত জানায় শাইলক। সামনের চেয়ার দেখিয়ে বসতে ইঙ্গিত করে। লোকটার দিকে তাকাতে কেমন একটা সংকোচ লাগে। একটা পাগল ঠকিয়ে কোটি টাকা ঝেড়ে দিলাম! বাইরে তাকায়! অনেক দূরে বহুতল বাড়ি, মেঘ, কিছুটা আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। ক'তলায় আছি? কম করে আট-দশ তলা তো হবেই। শাইলকের দিকে ফিরে সিকান্দার প্রশ্ন করে—এটা কি হোটেল?

– না, আমি পুরো বাড়িটাই কিনে নিলাম। এদেশে বড়সড় কিছু করতে চাই। আফিস বড় না হলে বড় কাজ করা যায় না। ওসব হোটেল-ফোটেলে যারা কারবার করে তারা ছিঁচকে বেনে। আমার ওসব চলে না। যাই হোক, শুনুন। কাগজ-পত্র রেডি। আপনার টাকা রেডি। আপনি বলেছিলেন অর্ধেক টাকা ক্যাশে নেবেন, অর্ধেক চেকে। সবই প্রস্তুত। তবে আপনার হয়ে একটা প্রশ্ন করছি—আপনি তো মফস্বলে থাকেন, ওখানে ফাইভ মিলিয়ান আই মিন, পঞ্চাশ লাখ টাকা ক্যাশ নেয়া কি ঠিক হবে? কোথায় রাখবেন? কাছাকাছি ব্যাঙ্ক আছে তো? ব্যাঙ্ক থাকলেও রাতারাতি আপনার টাকার অংকটা চারপাশে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াতে পারে। আমি অবশ্যি ভালো জানি না, এদেশের হালচালও আমার পুরো জানা নেই, তবে এসব ক্ষেত্রে এমনটাই হয়ে থাকে। আপনি যদি চান—এখানে, কলকাতায় একটা ব্যাঙ্ক একাউন্ট করে নিন। যতোটা দরকার ক্যাশ সঙ্গে নিয়ে বাকিটা ব্যাঙ্ক ফেলে দিন। কোনো ঝামেলা থাকবে না। কেউ কিছু অনুমান করতেও পারবে না।

– আপনি যে আমার জন্য এতোটা ভাবছেন...

– ক্লায়েন্টদের জন্য ভাবনা আমাদের ব্যবসার গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট।

– কিন্তু একাউন্ট করার ঝামেলা তো কম নয় : ছবি তোলা...ফর্ম ফিলাপ, গ্যারান্টার...সে তো দু-এক দিন লেগে যাবে।

শাইলক মুচকি হেসে বেল টেপে। সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘর থেকে পোরশিয়া এসে দাঁড়ায়। শাইলক ঘাড় অর্ধেকটা ঘুরিয়ে নির্দেশ দেয়—ব্যাঙ্ক ম্যানেজার! পোরশিয়া ফিরে যাওয়ার মিনিট খানেকের ভেতর একটা ফাইল হাতে মধ্যবিত্ত চেহারার মাঝবয়েসি বাঙালি ম্যানেজার ঢুকল। তাকে কিছু বলার দরকার হল না। সে সবকিছু জেনে, প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। টাইপ করা নাম ঠিকানাসহ সে ছাপানো ফর্ম এগিয়ে দেয় সিকান্দারের দিকে। সিকান্দার পরপর সই করে। একই সাথে অতীত বিক্রির দলিল দস্তাবেজেও সই সাবুদ করা হয়ে গেল। এর মধ্যে আর একজন এসে সিকান্দারের ছবি তুলল। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, সঙ্গে সঙ্গে ছবির প্রিন্টও পাওয়া গেল। আজকাল কলকাতায় নাকি এসব ক্যামেরা হাতে হাতে ঘুরছে। পোলারয়েড না কি যেন বলে। ফর্মে ছবি সাঁটা হল। এ্যাকাউন্ট হয়ে গেল। টাকা জমা পড়ল। সিকান্দার দশ লাখ ক্যাশে নেয়। সব মিলিয়ে এক কোটির

হিসেব মেলার পরও কাল রাতের এক লাখ হাতে থেকে যায়। সিকান্দার পাঁচশ টাকার দুটো বান্ডিল শাইলকের দিকে এগিয়ে বলে—আমার এক কোটির হিসেব এদিকে মিলিয়ে দিয়েছেন। এটা আগের, কাল রাতে দিয়েছিলেন, আপনার খেয়াল নেই।

– খেয়াল আছে। ওটা আপনাকে বোনাস হিসেবে দিলাম। আপনি আমার প্রথম বিক্রেতা। আমি আপনার খরিদ্দার হলেও এক্ষেত্রে আসল ব্যাপার উল্টো, আপনিই আমার খরিদ্দার। আপনার মাধ্যমে এই কেনাবেচার ব্যাপারটা নিশ্চয় বহু মানুষের কাছে ছড়িয়ে যাবে। অন্তত আপনার অঞ্চলে। তাতে আমারই লাভ। আমি মাল কিনে আপাতত গুদামে ঢুকাবো। তারপর সুযোগ মতো চড়া দরে বেচবো। সিকান্দার টাকাটা পকেটে ঢুকিয়ে মৃদু হাসে। পাগল খেপে গেছে। খেপুক! এক কোটির উপর বাড়তি এক লাখ বোনাস। ভালো! যা আসে—এসব পাগলের দেখা সারা জীবনে এক আধবারও মেলে না। যো ওয়াপ্‌সে আতা হ্যায় উও হালাল হ্যায়! হারামের মাল দিয়ে যা বাপ্, আমরা হালাল করে খাই! সিকান্দার উঠে দাঁড়ায়। শাইলক উঠে দাঁড়িয়ে ওর দিকে হাত বাড়ায়। সিকান্দার হাত মেলায়। শাইলক হাতটা শক্ত ক'রে চেপে ধরে বলল—আপনি ইচ্ছে করলে যেটুকু বাকি আছে মানে, আপনার বর্তমান ভবিষ্যৎ, আপনার স্ত্রীর অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ, বাড়ির যারা ছোট, মানে আপনার সন্তানদের ভবিষ্যৎ বিক্রি করে দিতে পারেন। এখন আমার কেনার পালা। ভালো দাম দেবো, মনে রাখবেন, ধীরে ধীরে দাম কমে যাবে। এই ব্যবসা এখন নতুন। লোকে নানা কারণে সহজে এগিয়ে এসে তাদের এসব মাল বেচতে চাইবে না। তারা জানে না যে এটাও এক ধরনের পণ্য, এসব মালও বাজারে বিকোয়। তাই তারা প্রথম প্রথম সন্দেহের চোখে দূরে দাঁড়িয়ে দেখবে। যখন তাদের ভরসা হবে তখন সব হুড়মুড় করে ছুটে আসবে। তখনই দাম কমতে থাকবে। সে জন্যে বলছি, আপনি আমার প্রথম ক্লায়েন্ট, আপনি দুটো পয়সা বেশি পান, আপনার শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক, এটা আমি সত্যিই চাই। সুতরাং বাড়ি যান, বাড়ির লোকের সাথে কথাবার্তা বলুন। আপনার গোটা পরিবারের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সবই আমি কিনে নেবো! এছাড়া আরো অনেক কিছুই বিক্রি করার আছে—যেমন, আপনার হৃদয়, স্বপ্ন, আপনার আত্মা! এসব জিনিস সত্যিই মূল্যবান। আপনার আত্মার জন্যে, যে কোনো লোকের হৃদয় স্বপ্ন কিংবা আত্মার জন্যে আমি আরো বেশি টাকা দিতে পারি। দেখুন, ভাবুন।

সিকান্দার সত্যিই ভাবনায় পড়ে যায়। আত্মার দাম আরো বেশি? বেচে দেবো? যাক, দুচার দিন যাক। তারপর দেখা যাবে। যদি তদ্দিনে দাম কমে যায়? তবু আপাতত থাক। অতো লোভ ভালো নয়। অন্তত দুটো দিন ঠাণ্ডা মাথায় ভাবি। সে শাইলকের হাত ছেড়ে এবার গম্ভীরভাবে বলে—নিশ্চয় ভাববো। এমন হতে পারে আমি কাল, না কাল হবে না। পরশু তরশু আপনার এখানে আবার আসবো।

– বেশ,আসুন। আমার দরোজা সব সময় আপনাকে স্বাগত জানাবে। আমি

সবাইকে বলে রাখছি—আপনি এলেই এরা সরাসরি আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। একটা কথা, আপনার এলাকায় যতো পারেন ব্যাপারটা চাউর করে দিন—আপনার মাধ্যমে যতো লোক আসবে—তাদের কাছ থেকে যে দামে মাল কিনবো তার টেন পার্সেন্ট আপনার কমিশন থাকবে। ধরুন, দু'চার দিনের ভেতর যদি কেউ তার আত্মা বিক্রি করে, মানে আপনার মাধ্যমে, তাহলে তাকে দু কোটি দেবো। দু কোটির কমিশান কুড়ি লাখ আপনি ঘরে বসে পাবেন! ঠিক আছে?

– ঠিক আছে। আমি অবশ্যই ভাববো। অবশ্যই আপনার হয়ে প্রচার করবো।

– করুন। কামাবার সুযোগ পেয়েছেন, কামিয়ে নিন। দুদিন পরে সব ডালভাত হয়ে যাবে। এসব জিনিস তখন মুদির দোকানে দু'পাঁচ টাকায় বিকোবে। তখন আর কামাবার সুযোগ পাবেন না।

– আমি ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নিলাম। ধরে নিন আপনার পাশে আছি, থাকবো। আপনি আমার উপকার করেছেন।

– ধন্যবাদ। প্রশংসা শুনতে আমার ভালো লাগে।

শাইলক আবার বেল বাজায়। পোরশিয়া আবার এসে দাঁড়ায়। শাইলক নির্দেশ দেয়—আন্তোনিও। একটু পরে আন্তোনিও ঘরে ঢোকে।

– আন্তোনিও!

– ইয়েস বস্!

– তুমি মিস্টার সিকান্দারের সঙ্গে যাবে। সিকান্দার বলল,

– না না তার দরকার হবে না। এ টাকা নিয়ে যাওয়া কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। তাছাড়া আমি একটা ট্যাক্সি ধরে সরাসরি বাড়ি চলে যাবো। বাস গাড়ির ঝামেলায় যাবো না।

– তবু একজন দক্ষ লোক আপনার সঙ্গে থাকলে ভালো। আন্তোনিও চৌকস লোক। দক্ষ শুটার। ওর কাছে সব সময় অত্যাধুনিক অস্ত্র থাকে। ও আপনার দেখভাল করবে। মনে রাখবেন, আপনি এখন একজন মানিডম্যান। আপনার নিরাপত্তা জরুরি।

– না না, দরকার হবে না। আমি খুব সামান্য মানুষ হলেও নির্বোধ নই। আমি নিজের দেখাশোনা করতে পারি।

– তবু আন্তোনিওকে আপনার সঙ্গে নেয়ার দরকার আছে। শাইলক এবার মৃদু হেসে যথাসম্ভব মোলায়েম কণ্ঠে আবার বলে—আপনার নয়, আমার দরকার। আপনি আমার কাছে যা বিক্রি করেছেন তার কোনো বস্তুগত আকার নেই। সবটাই আপনার কাছে গচ্ছিত, ঠিক?

– তা ঠিক।

– তা হলে আমার গচ্ছিত মাল, যা আপনার কাছে জমা আছে তা ইচ্ছে করলে আমার অসাক্ষাতে আপনি অন্য কাউকে আবার বেচে দেবেন না তার কোনো প্রমাণ রাখতে পারেন, মিস্টার সিকান্দার?

– না, তা অবশ্যি পারি না।

– তা হলে আমার মালের দেখভাল করার জন্যে আমার নিজস্ব পুলিশ তদারক করবে তাতে আপনার আপত্তি থাকার কারণ দেখি না। তবে আপনার দুশ্চিন্তার কিছু নেই। ওর যাবতীয় খরচ পত্র আমার অফিস থেকেই যাবে। আপনি ওর থাকার বন্দোবস্ত করে দেবেন। মানে আপনার খুব কাছাকাছি। দরকার হলে থাকার জন্যে ভাড়াও দেয়া হবে।

– না, না তার দরকার হবে না।

– আচ্ছা সে সব পরে দেখা যাবে। আপাতত আন্তোনিও আপনার বন্ধু। মনে রাখবেন, আন্তোনিও একজন উচ্চশিক্ষিত আধুনিক মানুষ। দুনিয়ার খোঁজ খবর রাখে, জানে। তাছাড়া একজন অতি দক্ষ নিরাপত্তা কর্মী। আপনার কাছে এমন একজন মানুষ থাকলে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। একই সঙ্গে একথাও জানিয়ে দিই। ও আপনার শুধু বন্ধু নয়, পরামর্শদাতাও হতে পারে, গাইড হতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, আপনার সেবক—চাকর! যে কোনো ছোট কাজও ওকে দিয়ে নির্দ্বিধায় করিয়ে নিতে পারেন। ওরা সে ভাবেই অভ্যস্ত। ছোট বড় যে কোনো কাজে ওকে ছায়ার মতো আপনার পাশে রাখবেন।

আচ্ছা, বেশ তাই হবে।

– তাহলে আপনি পরশু বা তার পরদিন আসছেন?

– অবশ্যই।

– আমি আপনার আত্মার দিকে আমার চোখ তাক করে আছি, মিস্টার সিকান্দার! আমি আপনার আত্মা কিনে নিতে চাই!

পাঁচ

এমন ঝকঝকে গাড়িতে কোনোদিন উঠেছি? মনে পড়ছে না। মনে পড়বে কিভাবে, ঘটনা না ঘটলে তো মনে পড়ার প্রশ্ন ওঠে না। না, সত্যিই এমন গাড়িতে কোনোদিন চড়িনি। সারা জীবনে ক'দিন আর গাড়ি চড়ার সুযোগ পেলাম। এর সাথে তার সাথে এক আধা দিন। তাও এমন ঘেঁসে এতোটা চেপে যে চড়ার চেয়ে না চড়াই ভালো ছিল। এখন কেমন একটা সুখের অনুভূতি আসছে। ভিড় নেই, গাদাগাদি নেই, ঠেলাঠেলি নেই। গাড়িটা চালাচ্ছেও ভালো। আন্তোনিও পাকা ড্রাইভার। শাইলক তো বলেই দিয়েছে লোকটা উচ্চ শিক্ষিত, দক্ষ, সব কাজে ওস্তাদ। তা এমন একজন লোক অ্যাসিসটেন্ট হিসেবে পাশে থাকলে মন্দ কি। মাঝে মধ্যে দরকারে লাগতে পারে। যেমন, ইংরেজিতে ড্রাফট করা। কোনো চিঠিপত্র কিংবা দরখাস্ত এসব ইংরেজিতে করার দরকার পড়লেই হয়ে গেল! এক পাতা লিখতে এক ঘণ্টা লাগবে। তাও বার বার কাটো বার বার ছেঁড়ো, অবশেষে

যাও বা একখানা মাল দাঁড় করালাম তা মনের মত হল না। আসলে ইংরেজির চর্চা নেই তো হবে কি ভাবে? এদিকে বলছে ইংরেজি হঠাও, ওদিকে ইংরেজি না জানলে এক পাও এগোনো যাবে না। মানুষ, সাধারণ মানুষ কি ভাবে বেঁচে থাকবে, ছেলেপিলেগুলো কি ভাবে চাকরি পাবে? আমার তো চাকরি না হওয়ার মূলে মনে হয় ইংরেজিটা ভালো ভাবে না জানা। এটাই একমাত্র কারণ। অবশ্যি চাকরি থাকলে তো পাওয়ার প্রশ্ন। চাকরি কোথায়? সব ইংরেজি জানা ছেলেমেয়ে চাকরি পাচ্ছে? না। তবে না জানার চেয়ে জানা ভালো এটা মানতেই হবে। যাক, একজন ইংরেজি জানা ভালো অ্যাসিস্টেন্ট পাওয়া গেছে, ওসব নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না।

– কোন্ দিকে যাবো? ডানে না বাঁয়ে?

গড়িয়াহাট চৌরাস্তার মোড়ে এসে আন্তোনিও জিগ্যেস করল। 'সোজা' বলেই সিকান্দার আবার বলে—দাঁড়ান! গাড়ি সাইড করুন, কিছু জিনিস কিনবো। গাড়ি পার্কিং জোনে দাঁড় করিয়ে আন্তোনিও পেছনে ফিরে বলল—আমি গাড়িতে বসি? সিকান্দার দরোজা খুলে নামতে নামতে জবাব দেয়—না, আপনিও আসুন, একটু দেখে দেবেন। আন্তোনিও গাড়িতে চাবি লাগিয়ে ওর পেছন পেছন এগিয়ে গেল।

কোন্ দোকানে যাবে? আগে কিছু জামা কাপড় কেনা দরকার। ছেলে-মেয়েগুলোর কাপড় জামা কিছু নেই। ছেঁড়া নোংরা কাপড় পরে স্কুলে যেতে চায় না। ওদের তো নেই কিন্তু আর কারই বা আছে? মার শাড়ি ছেঁড়া, আব্বার লুঙ্গি পানজাবি ন্যাকড়ার মতো হয়ে গেছে, সুরাইয়া কিছু বলে না বটে কিন্তু ওর দিকে ভালো করে তাকানো যায় না। যুবতী মেয়ে, শরীর ঢাকতে হিমশিম খেয়ে যায়। বাড়ির মধ্যে একমাত্র আমার কাপড় চোপড় যাহোক একটু বাইরে বেরুবার মতো আছে। এটুকু না থাকলে আর ভেবে লাভ নেই। এক্ষুনি সব ব্যবস্থা করছি। বাচ্চাদের জামাকাপড় ঝুলতে দেখে সেই দোকানে ঢুকল ওরা। দুই ছেলে এক মেয়ের জন্যে মোটামুটি জনা কুড়ি বাচ্চার মতো কাপড় কিনে তবে বের হয়। বেশি হয় হোক, নিজেরা না পরতে পারলে অন্য কাউকে দেবে। তবু মন ভরে নাড়াচাড়া করুক। বাচ্চা কাচ্চা, কোনোদিন কিছুই সেভাবে দেয়া যায়নি। এখন পয়সা আছে, দেবো না কেন? এবার কোথায়? শাড়ির দোকানে। শাড়ির দোকানের অভাব নেই। বড় একটা দোকানে ঢুকে আগে মায়ের জন্যে খান পাঁচেক কেনা হল। এবার সুরাইয়ার। প্রথমে ভেবেছিল, খান পাঁচেক ঘরে পরার আর খান পাঁচেক একটু বেশি দামের কিনবে। এই ধরা যাক, হাজার খানেক করে এক একটা। বাইরে যাওয়ার মতো শাড়ি কাপড় নেই বেচারির। কাপড়ের অভাবে বাপের বাড়ি পর্যন্ত যেতে চায় না। প্রথমে যেটা পছন্দ সেটার দাম পাঁচ হাজার পাঁচশ। এটাই সবচেয়ে কম দামের। বাকি চারখানা মিলিয়ে সুরাইয়ার বাইরে পরার শাড়ির দামই শুধু সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচশ! তা হোক, কোটিপতির বউ বলে কথা! এবার একটা টিভি। একটু হেঁটে টিভির দোকানে ঢুকে তো চক্ষু চড়ক গাছ। এতোসব সৌখিন জিনিস মানুষ

ব্যবহার করে? সুতরাং শুধু রঙিন টিভিতে হলো না, থ্রি ইন ওয়ান, ওয়াকম্যান, একটা ক্যামেরা, একটা ভিসিআর এবং আরো খুচরো টুকিটাকি। এবার কোথায়? নিজের জন্যে তো কিছু কাপড় দরকার। রেডিমেড প্যান্ট শার্টের দোকানে ঢুকে প্রথমে ভেবেছিল, মোটামুটি মাঝারি দামের মধ্যেই কিনবে। কিন্তু এমন চোখ, যেটা চোখে ধরে সেটার দাম শুনেই ছিটকে পড়ার মতো অবস্থা। অবশ্যি পকেট এখন এতোটা উঁচু যে ছিটকে পড়তে গিয়ে পকেটে হাত পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের গলা দিয়ে নিজের অজান্তেই আওয়াজ ওঠে—বেশ তো, প্যাকেট করুন! পুরুষদের জামা কাপড়ের দাম যে এতোটা বেড়েছে জানা ছিল না। দোকানের বিল কত হলো, সেসব বাহুল্যে না গিয়ে শুধু প্যান্ট আটকাবার বেল্ট এর দামটা শুনিয়ে দিলেই একটা ধারণা পাওয়া যাবে—আঠারো শ! হ্যাঁ, মাত্র একটা বেল্টের দাম! তো নসীব সিকান্দারের নসীব মানে কপাল তখন সিকান্দার মানে সম্রাট আলেকজান্ডারের মতোই উঁচু। সুতরাং এখন উঁচকপালে সিকান্দার একটু উঁচুতে খেলবে সে আর বিচিত্র কি? হ্যাঁ, এবার একটু গয়নাগাটি? নিশ্চয়! দুটো মেয়ে আছে, বড়ো হচ্ছে, গয়না-গাটি থাকলে দোষের কিছুই নেই। বরং পরে কাজে লাগবে। আর মেয়ের যখন হচ্ছে সেই সাথে মেয়ের মায়ের্ দু-একখানা হবে না, তাই কি হয়? সুতরাং ঘণ্টা খানেক দোকান বাজার করতেই মোটামুটি আড়াই লাখের মতো বেরিয়ে গেছে। তাও অনেকটা হাত চেপে! এখনো কিছু কিনতে গেলেই মনে হয়, না থাক, পরে দেখা যাবে। একটা হাত চাপা ভাব রয়েই গেছে। দুচার দিন আরো লাগবে, তারপর হাত ঠিকই খুলে যাবে। টাকার বান্ডিল পকেটে থাকলে হাত খুলতে কতোক্ষণ?

নসীব সিকান্দার মালামালগুলো গাড়িতে ঠেসে ঢুকিয়ে নিজে গ্যাঁট হয়ে বসতে না বসতে জানালা দিয়ে আস্তোনিও মোলায়েম কণ্ঠে বলল—স্যার, কাপড় পাল্টে নিতে পারেন। আমি বাইরে আছি।

'স্যার'? নয় কেন? আমি তো ওর বস। লোকটা যতই উচ্চ শিক্ষিত হোক, যতই দুনিয়াদারির খোঁজ খবর রাখুক আসলে ও তো আমার অ্যাসিসটেন্ট মানে, চাকর। স্যার তো বলতেই পারে। বলা উচিত। অবশ্যই! নিজের সম্পর্কে বেশ একটা মনোরম ধারণা তৈরি হচ্ছে। হ্যাঁ, একটু ধীর গতিতে। তা হোক, এই আত্মপ্রত্যয়টা খুব দরকারি। বড় মানুষের ক্যালানে স্বভাবে মানায় না। তাদের হতে হবে দৃঢ়, প্রত্যয় কর্তৃত্বব্যঞ্জক। সিকান্দার হাতের কাছে প্রথম যে প্যাকেটা পায় সেটা খুলেই প্যান্ট জামা পাল্টায়। অসাধারণ! জামা প্যান্ট দুটোই খুব রুচিশীল হয়েছে। গাঢ় রং ওর পছন্দ নয়। ওসব তৃতীয় শ্রেণীর রুচির প্রকাশ। ক্যাটকেটে লাল, নোংরা নীল, জঘন্য সবুজ, ইতর হলুদ—ওসব কোনো রং নয়, অন্তত পুরুষের জামা পান্টের রং হতে পারে না। হ্যাঁ, এই হলো আসল রং, ধূসর। ধূসর রং-এর ওপর খুব সূক্ষ্ম কালো স্ট্রাইপ, চমৎকার। প্রায় একই রংয়ের প্যান্ট। লাভলি! ও দ্রুত হাতে কাপড় পাল্টে গাড়ির আয়নায় নিজের মুখ দেখতে চায়, পারে

না। আরো সরে যেতে হবে। দরকার নেই। পরে দেখা যাবে। নতুন কেনা ব্রিফকেসের ভেতর টাকার বান্ডিল এবং আগের নোংরা নোটবুক আর টুকিটাকি কাগজ ঢোকায়। পুরনো প্যান্ট জামা আর চপ্পল জোড়া আগের নোংরা ঝোলাব্যাগে ভরে ব্যাগটা গাড়ির জানলা দিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়। পুরনো জীবন খতম। এবার সম্পূর্ণ নতুন সমৃদ্ধ, প্রত্যয়দীপ্ত এক জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

ছয়

মলয়ের বাড়ির গলিতে গাড়ি ঢোকে না। আন্তোনিওকে গাড়িতে রেখে ব্রিফকেসটা হাতে নিয়ে নসীব সিকান্দার বেরিয়ে এল। একটু অস্বস্তি লাগছে। নিজের পরিবর্তিত রূপ দেখে নিজেই সংকোচ বোধ করে। পায়ের দামি চপ্পল জোড়া খুব মোলায়েম সন্দেহ নেই, তবে সড়গড় হতে দু একদিন সময় লেগে যাবে। পায়ের পাতার ওপরের দিকটায় ব্যথা লাগছে, ফোসকা পড়তে পারে। মোটকথা, নিজের পরিবর্তিত ভাগ্যের সঙ্গে মানিয়ে নিতে, অভ্যস্ত হতে একটু সময় দিতে হবে। কিন্তু সে সময় দেয়ার মতো সময় নেই। বাধ্য হয়ে জোর করেই স্বাভাবিক হতে হবে। সে দৃঢ় পায়ে কিন্তু ধীর পদক্ষেপে গলি দিয়ে এগিয়ে চলল। পাড়াটা চেনা। দু একজন ওকে দেখেছে, মুখ চেনে। প্রায় দশ বারো বছর ধরে মলয় এই বাড়িতে আছে। নানান দরকারে বেদরকারে সিকান্দারকে এখানে আসতে হয়েছে অনেকবার। যারা ওকে চেনে তারা ওর দুস্থ রূপটাই দেখেছে। এখন হঠাৎ, রাতারাতি চেহারা পাল্টানোয় তারা একটু বিস্মিত চোখে ওর দিকে তাকায়। তবে দু একজন। এই গলিতে ঠিক দুপুর বেলায় কে আর বাইরে থাকবে। লোকেদের বিস্মিত দৃষ্টিকে আমল না দিয়ে ও মলয়ের বাড়ির গেট বেরিয়ে সিঁড়িতে পা রাখলো। চমৎকার! চপ্পলটায় কোনো শব্দ ওঠে না। গাঁড়লদের মতো থপথপ ঝপঝপ মচমচ শব্দ তুলে হাঁটতে ভালো লাগে না। ব্যাপারটা রুচিহীন। ভদ্রলোক হাঁটবে নিঃশব্দে। কাউকে বিরক্ত না করে, চমকে না দিয়ে। পায়ের জুতোও তেমন হওয়া চাই। ও নিঃশব্দে দোতলায় উঠে কলিং বেলে হাত রাখে। মলয় কি বাড়িতে থাকবে? না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। না থাকলে আর জমানো যাবে না। ওর বউকে আর কী দেখাবো? ওকেই একটু রং দেখাতে চেয়েছিলাম। ঠিক হ্যায়, ও বাড়ি না থাকলে ওর বউ অন্তত খানিকটা দেখে রাখুক। মলয় বাড়ি ফিরলে বলবে। বলবে তো অবশ্যই। কাল ছিলাম দুস্থ, দুর্বল, কৃপাপ্রার্থী, নোংরা জামাকাপড়ে বেমানান একটু নগণ্য মানুষ। আর আজ?

দরজা খুলল মলয়। ওকে নতুন বেশে দেখে কয়েক পলক হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর দ্রুত নিজের বিস্ময় কাটিয়ে স্বাগত জানায়। আরে, আয়, দাঁড়িয়ে রাইলি কেন?

– তোরা মনে হচ্ছে দরোজা আটকে দাঁড়ানোটা ভালোই রপ্ত করেছিস? দরোজায় দাঁড়িয়ে থাকলে লোকে ঢোকে কীভাবে?

– কি রে ব্যাটা, খুব রং নিচ্ছিস, ভোল পুরোটা পাল্টে ফেলেছিস, লটারি মেরেছিস না কি!

ওদের কথার ফাঁকেই মলয়ের বউ পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সিকান্দারের আগামাথায় চোখ বুলিয়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মলয়ের বউকে দেখেই সিকান্দারের চাপা রাগটা জেগে ওঠে। যা বলার যেটুকু ঝাড়ার আগে ঝেড়ে নিতে হবে। একবার অন্য কথায় ঢুকলে আর ঝাল মেটানো যাবে না। সিকান্দার মলয়ের কথার জবাব দিল ওর বউয়ের দিকে তাকিয়ে—লটারি না মারলে তো তোরা কারো সাথে ভদ্র ব্যবহার করতে পারিস না। মছলন্দপুর থেকে টালিগঞ্জ, সকাল আটটা সাড়ে আটটায় পরপর তিনদিন এসে ফিরে গেলাম, একটা খবর পর্যন্ত রেখে যেতে পারিস না, আশ্চর্য! নিজেদের কি ভাবিস তোরা বলতো? তোর এখানে আটটায় পৌঁছাতে গেলে আমাকে কটায় বাড়ি থেকে বেরুতে হয়?

– আরে বোস, বসে কথা বল, আগে শোন...

– ছাড় তোর শোনাশুনি! তোর বউকে জিগ্যেস করলেই সেই এক ডায়লগ—'কিছু বলে যায়নি তো'। একটা মানুষ সাতসকালে ঠেঙাতে ঠেঙাতে অতো দূর থেকে এখানে এলো, মানুষটা অচেনা কেউ নয় ছোটবেলার বন্ধু, একটু বসতে বলতে হয়, একটু দম নেয়ার সুযোগ দিতে হয়। সেসব বালাই তো তোদের নেই। বউকে এটুকু শেখাতে পারিসনি যে পুরনো বন্ধুরা এলে অন্তত এক গ্লাস জল আর এক কাপ চা, অন্তত দুধ ছাড়া এক কাপ লাল চা খাওয়ানো দরকার। এটা সাধারণ ভদ্রতা, এর জন্যে পঞ্চাশ পয়সা খরচা করলেই হয়ে যায়।

– আরে কি মুশকিল...

– ছাড় তোর মুশকিল! কার মুশকিল নেই বলতো? মুশকিলে পড়েছি বলেই তো পরপর তোর পাঁয়তারা সহ্য করেও আবার আসতে হচ্ছে, আরে মুশকিলে পড়েছি বলেই তো তোর বউ ঘরের দরোজা আটকে দাঁড়িয়ে বলবে—'কই কিছু বলে যায়নি তো!' ব্যস, হয়ে গেল। তারপর ঘামতে ঘামতে সিঁড়ির শেষ ধাপে নামার পর পেছন থেকে শোনা যাবে—একটু চা খেয়ে যাবেন না! বউকে একটু শেখা—কোনো ভদ্দর লোকের ছেলে এমন ভদ্রতার গুঁতো খেয়ে সিঁড়ির শেষ ধাপে নামার পর ফের চা খেতে ওপরে ওঠে না! তোর বউকে আরো একটু শেখা–আমরা পুরনো বন্ধুরা গরিব হতে পারি, দুস্থ হতে পারি, কিন্তু চোর ডাকাত গুণ্ডা কিংবা রেপিস্ট নই।

– আরে থাম থাম... আগে বোস্...

– বসার আগে একটু জিগ্যেস করি—তোর বাড়িতে এলে এক কাপ শুকনো চা খাওয়াতে পারিস না অথচ আমার বাড়ি এই কুড়ি-পঁচিশ বছরে অন্তত একশবার গেছিস, এই একশ বারের ভেতর একবারও কি ভাত না খেয়ে আসতে পেরেছিস?

বল, বুকে হাত দিয়ে বল্...

– আরে সিকান্দার, কি আরম্ভ করেছিস, প্লিজ...

– গুলি মার তোর প্লিজ! আমি বিরিয়ানি পোলাও না খাওয়াতে পারি অন্তত দুটো ডাল ভাত না খাইয়ে অবেলায় কাউকে ছাড়ি না। জীবনেও ছাড়িনি। আর তোরা তোদের বউকে এক কাপ চা বানিয়ে খাওয়াবার শিক্ষা দিতে পারিস না।

মলয় এবার এগিয়ে এসে ওকে জড়িয়ে ধরে চেয়ারে বসায়। স্ত্রীর দিকে একবার রুক্ষ চোখে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলে—বোস, শান্ত হয়ে বোস। ও খুব অন্যায় করেছে। সত্যিই মারাত্মক অন্যায় করেছে। ওর হয়ে আমিই ক্ষমা চাইছি।

মলয়ের স্ত্রী কি করবে বুঝতে না পেরে আমতা আমতা করে—আমি তো—উনিই তো দাঁড়াতে চান না—ওনাকে দেখে খুব ব্যস্ত মনে হয়, তাই...

– থামো! আমারই ভুল। আমি একটা খবর রেখে যেতে পারতাম। যাকগে, ঠাণ্ডা হয়ে বোস, সিকান্দার, রাগ করিসনে। যতটা বাজে ভাবছিস অতোটা বাজে আমি হইনি এখনো। বিশ্বাস করবি? আমি এই তিনদিন তোর কাজটার জন্যেই ভোর ভোর করে বেরিয়েছি। শোন, আমি এখনো সেই পর্যায়ে উঠতে পারিনি যে ইচ্ছে করলেই যেকোনো মুহূর্তে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার বের করে দিতে পারি। কিছু টাকা আমার হয়েছে সত্যি, তোর কাছে লুকিয়ে লাভ নেই। তুই কম বেশি জানিস—কিন্তু সে টাকা এদিক ওদিক খাটছে। চট করে বের করা যাবে না। একটা পেমেন্ট পাওয়ার কথা চলছিল দিন সাতেক ধরে। সেইটের ভরসায় তোকে আসতে বলেছিলাম। লোকটা পর পর এমন ঝোলান ঝোলালো, রোজই বলে কাল ভোরে আসুন, দিয়ে দেব। শেষে গতকাল বেশ একটু চোটপাট করতেই আজ সকালে টাকাটা হাতে পেলাম। আমি ভাবছিলাম, একবারে টাকাটা নিয়েই মছলন্দপুর যাবো, একদিনের ভেতর কোর্টকাচারির ঝামেলাটা মিটিয়ে নিশ্চিন্ত হবো। তাছাড়া টাকাটা তোর জরুরি দরকার। শোন, ওখানে যা কিছু করি—রিসোর্ট হোক কিংবা ওল্ড এজ হোম যাই হোক তোকেই দায়িত্ব নিতে হবে। আমার পক্ষে ওখানে গিয়ে দেখা শোনা করা সম্ভব না। তোর ভরসাতেই করছি। যা আসবে তুই কিছু রাখবি আমায় কিছু দিবি। ঠিক আছে?

না, একটু বেশি চোটপাট হয়ে গেল। মলয় তো সত্যিই খুব একটা খারাপ ছেলে নয়! ছোটবেলা থেকেই তো দেখছি। ওর বউটাই যা অভদ্র। অবশ্যি দিন কাল যা পড়েছে, বাড়িতে পুরুষ ছেলে না থাকলে বাইরের লোককে আগ বাড়িয়ে কজন বসতে বলার সাহস করে? তাছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই। ওদের দুটো বাচ্চা আর ওরা দুজন। বাচ্চা দুটো সকাল সকাল নিশ্চয় স্কুলে যায়। তার মানে, বাড়িতে একা। একেবারে একা। ওর পক্ষে বাইরের একজনকে বসতে বলা মুশকিল। কিন্তু আমি কি সত্যিই খুব বাইরের? কুড়ি পঁচিশ বছরের বন্ধুত্বের পরও একটা মানুষ আপন হতে পারে না? একটা পরিবারের মানে, এই সব শহুরে পরিবারের বিশ্বাসভাজন বন্ধু হতে গেলে কতো বছরের বন্ধুত্ব জরুরি? মনে হয়, দু

পাঁচ হাজার বছর লাগবে! তার কমে সম্ভব নয়। না, ঠিকই হয়েছে। একটু ওষুধ দেয়ার দরকার ছিল। যা খুশি ব্যবহার করবে অথচ মুখ বুজে সহ্য করে যেতে হবে? আরে জানোয়ার! নিজের বাড়িতে যদি কাউকে দশ মিনিট বসিয়ে এক কাপ চা খাওয়াবার যোগ্যতা না থাকে তো অন্য লোকের বাড়ি গিয়ে দিনের পর দিন ভাত গিলতে লজ্জা লাগে না? ঠিকই হয়েছে, ছোট লোকের দল!

মনটা বেশ ফুরফুরে লাগছে। কাউকে ঝেড়ে কাপড় পরাতে পারলে মনে আনন্দ আসে। মেজাজ ঠিক হয়ে যায়। তবে হ্যাঁ, যাই বলি না কেন, পকেট যদি আজ গরম না থাকতো, ওর কাছে সাহায্যের আশায় আজও আসতে হতো তবে কি আর এতো কথা বলতে সাহসে কুলোতো? অসম্ভব, সব কিছুর গোড়ায় সেই নোট, চকচকে নোটের বান্ডিল। যাকে ভালো বাংলায় বলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। অতীত বেচি আর ভবিষ্যৎ বেচি, সত্তা বেচি আর আত্মা বেচি কোনো সমস্যা নেই। শুধু নোটের বান্ডিল ঠিক মতো হাতে আসছে কিনা খেয়াল রাখো। আরে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে আর সব জায়গায় দাসত্ব করবো সেও ভালো। টাকার বান্ডিল হাতে এলে সমস্ত দাসত্বই মধুর, মনোরম, উপভোগ্য!

মলয়ের বউ চা মিষ্টি এনে সিকান্দারের সামনে রেখে কাঁচুমাচু হয়ে বলল—সিকান্দারদা, কিছু মনে করবেন না। সিকান্দার জবাব দেয়ার আগেই একটা একশ টাকার বান্ডিল এনে মলয় ওর সামনে রেখে বলে—নে, এটা তোর কাছে রাখ, কোনো লেখাপড়ার দরকার নেই। কাল পুরোটা নিয়ে আমি সকাল সকাল আসছি। লেখাপড়া যা করার কাল করা যাবে। তুই সকালে বাড়ি থেকে বেরুবি না। একসঙ্গে সকাল সকাল কোর্টে যাবো। আরে গর্দভ! চিরকাল ওভার বাতেলা মারতে মারতে ভবিষ্যৎটা ফর্সা করে ছেড়েছিস। নে, এখন ঠাণ্ডা হয়ে মালটা পকেটে ঢোকা।

মলয় কথা বলতে বলতে ওর দামি জামাকাপড়ের দিকে বার বার চোখ বোলায়। মলয়ের স্ত্রীও তাই। ওরা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। হঠাৎ লোকটার ভোল পাল্টে গেল কীভাবে। যদিও সিকান্দার ছোটবেলা থেকেই বাকপটু, কখনো কখনো কর্কশ, খানিকটা রগচটা কিন্তু মানুষটা অসৎ নয়। বন্ধুবৎসলও বটে, এক ধরনের উদারতাও আছে। এক ধরনের এই জন্যে, তার চেয়ে বেশি উদার হতে গেলে বা ধরন পাল্টাতে গেলে পকেটে কাগজের বান্ডিল দরকার। আর এই কাগজের বান্ডিল জিনিসটা পকেটে আনতে গেলে যেটুকু উদ্যোগ উদ্যম এবং চাতুর্য দরকার সেটুকু সিকান্দারের নেই। সেই রকমের এক আহাম্মক হঠাৎ রাতারাতি ভোল পাল্টায় কীভাবে? সিকান্দার ব্রিফকেসের পাশ থেকে একটা ক্যাডবেরির বড় টিনের প্যাকেট বের করে বলল—তোর জবাবটা পরে, আগে তোর বউয়ের জবাব দিয়ে নিই—কিছু মনে করবো না দুটো শর্তে—এক, এই ক্যাডবেরিরর প্যাকেটটা আপনার বাচ্চারা ফেরা মাত্রই হাতে ধরিয়ে দেবেন।

– দেখ কাণ্ড! এ তো অনেক দাম, এসব কেন?

মলয়ের স্ত্রী সলজ্জ হাসি হেসে প্যাকেটটা হাতে নেয়। মলয় মৃদু হাসতে থাকলেও তার মনে প্রশ্নটা ক্রমশ জোরালো হতে থাকে। কি ব্যাপার, কোথেকে টাকা পেল? সিকান্দার ওদের সঙ্গে হাসতে হাসতে আবার শুরু করে—দুই নাম্বার শর্ত—আমি আপনার এখানে জল স্পর্শও করবো না। প্রতিজ্ঞা! কারণ ভীষণ রেগে গেছি! রাগের কারণ—সকালে অতি ওভার ব্রেকফাস্ট! মানে এমন গেলা গিলেছি যে জলও খেতে পারবো না।

– সেকি! অন্তত চা খান, প্লিজ, না হলে ভাববো, এখনো রেগে আছেন।

সিকান্দার এবার সশব্দে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে জবাব দিল—সত্যিই রেগে আছি। আর রাগটা ভাঙবো বলেই তো এতো রাগ দেখালাম। যেন এরপর থেকে নিয়মিত চা পাই। না, সত্যিই এখন চা স্পর্শ করবো না। আপনি এবার উল্টে রাগ করবেন না যেন। এবার শোন, তোর অই পুঁচকে টাকার বান্ডিলটা যেখানে ছিল সেখানে রেখে আয়। আমার জমি বিক্রির দরকার নেই। আমার পকেট এখন গরম, খুব গরম! তোর দরকার হলে আমিই তোকে ধার দিতে পারি।

– কোথেকে পেলি? চুরি ডাকাতি করিসনি তো? সত্যি কথা বল।

– তুই কোথেকে পেলি? ব্যাটার দুবছর আগেও তো মহুলন্দপুর যাওয়ার পর ফেরার গাড়িভাড়া আমাকেই দিতে হতো! এই দুবছরে কলকাতায় বাড়ি, দোকান, আরো কি সব করেছো তলে তলে কে জানে! বল কোথেকে পেলি, চুরি করে না ডাকাতি করে?

– আরে দু বছর মানে তো দুই দুটো বছর, দুই রাত তো নয়। তুই দুই রাত আগেও ভিখিরি ছিলি—এখন তো সত্যি সত্যি সিকান্দার মনে হচ্ছে।

কীভাবে বল্, রহস্যটা বল তো?

– আমি আমার অতীত বিক্রি করেছি।

– কি বলছিস? তোর মাথা খারাপ হলো না কি?

– না। পুরোপুরি ঠিক আছে। একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি এইসব কেনাবেচা শুরু করেছে। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব বিক্রি করা যাবে। ইচ্ছে করলে তুইও বিক্রি করতে পারিস। তোর বউ ছেলে মেয়ে সবাই পারে। আমি এখন ওদের এজেন্ট। বিশাল অঙ্কের টাকা পাবি। যদি চাস কাল সকালেই আমার বাড়ি চলে আয়। সব ঠিক ঠিক বুঝিয়ে দেবো। কিন্তু দেরি নয়, তাড়াতাড়ি, কালপরশুর মধ্যেই আসবি। যত দিন যাবে দাম কমে যাবে। যে কোনো নতুন মাল বাজারে এলে যেমন চড়া দাম থাকে তারপর আস্তে আস্তে পড়ে যায়। এটাও তেমনি।

– নারে ভাই, ওসব উদ্ভট ব্যাপারে আমি নেই। তোর অতীত তুই যেখানে পারিস বেচে দে, আমাদের দরকার নেই।

– সিকান্দার বেনসনের প্যাকেট বের করল। একটা মলয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে একটা নিজে ধরায়। দুজনে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে দুজনের মুখ অস্পষ্ট করে

ফেলে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে মলয়ের স্ত্রী সিকান্দারের কথা শোনে। এও কি সম্ভব? অতীত বিক্রি! কখনো শুনিনি। সে বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বলে—কতো টাকা দেয়?

সিকান্দার এবার দক্ষ এজেন্টের মতো খেলতে শুরু করে। মলয়ের স্ত্রীর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে মলয়ের দিকে তাকায়। চাপা, কর্তৃত্বব্যঞ্জক গলায় প্রশ্ন করে—কত টাকা হতে পারে, বল্? এনি অ্যামাউন্ট। যা মনে আসে বল্। অনুমান কর।

– আমি বলবো?

– বলুন।

– এক লাখ।

মলয়ের স্ত্রীর কথায় অবজ্ঞার হাসি হেসে সিকান্দার জবাব দেয়—বেশ তো, আপনার অতীতের জন্যে এখনই আপনাকে একলাখ দিতে পারি। তবে একটা শর্তে—আর চাইতে পারবেন না। এক লাখের ওপরে যা পাবো আমার। রাজি? কথা বলতে বলতে সে ব্রিফকেসটা এমন ঘুরিয়ে খোলে যেন পাঁচশ টাকার বান্ডিলগুলো ভালোভাবে ওদের নজরে পড়ে। তারপর দুটো বান্ডিল তুলে মহিলার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে—নিন। লেখাপড়ার দরকার নেই। লেখাপড়া কাল হবে।

স্বামী স্ত্রী দুজনে পরস্পরের দিকে তাকায়। এমন উদ্ভট কথা কেউ কখনো শোনেনি। মলয় ব্যবসায়ী মানুষ। সে অবস্থায় আঁচ পেতে জিগ্যেস করে—তুই কতো দামে বেচলি?

সিকান্দার টাকার বান্ডিল ব্রিফকেসের উপর রেখে জবাব দেয়—আমার প্রসঙ্গ ছাড়। আমার দামের সাথে তোদের দামে নাও মিলতে পারে। শোন, আজ তোরা ভাবনা চিন্তা কর। যদি ইচ্ছে হয়, কাল সকালে আমার বাড়ি আসতে পারিস।

এতদিন ধরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যা কামিয়েছিস তার দশগুণ পাবি! মনে রাখিস, এ সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে গেলে পরে পস্তাতে হবে। আরে, অতীত ফতিত এর মূল্য কিরে? অতীত ভবিষ্যৎ যার যার পকেটে রেখে নোংরা করে পচিয়ে ফেলে কার লাভ? তার চেয়ে যদি ভালো দামে বেচতে পারি, কেন বেচবো না? শোন্, দুনিয়া পাল্টে গেছে, এখন সব কিছুই পণ্য। সব কিছুই বাজারে বিকোয়। সব কিছুই পেটেন্ট করে বাজারে ছাড়া হচ্ছে। এই মওকায় যা আছে সব বেচে দে। আমরা অভাবী মানুষ। চৌদ্দ পুরুষের রোজগার যদি এক হাতে করে যেতে পারি তো ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্ত! দিনকাল খারাপ। ভবিষ্যৎ বেচেই ভবিষ্যৎ গোছাতে হবে!

মলয় গভীর চিন্তায় ডুবে যায়। সে কোনো সিদ্ধান্ত করতে পারে না। ব্যবসায়ী মানুষ। মোটা টাকা নাকের ডগায় নাচতে থাকলে লোভ সামাল দেয়া মুশকিল। তাও কিনা খাটাখাটুনি ছাড়াই। কিন্তু পুরো ব্যাপারটার ভেতর কোথায় যেন অস্বাভাবিকতা আছে। বিপদে পড়বো না তো? লোভে পড়ে টাকা নিয়ে শেষে কাদের খপ্পরে পড়ি কে জানে! সে স্ত্রীর দিকে তাকায়। স্ত্রী সিকান্দারের দিকে। সিকান্দার ওদের দোনোমনা ভাব দেখে একটু পেছনে টানে। ব্রিফকেসের ভেতর

টাকাগুলো ঢুকিয়ে ব্রিফকেস বন্ধ করে উঠে দাঁড়ায়। মলয়ের দিকে একবার তাকিয়ে দরোজার কাছে যেতে যেতে বলে—আমি চললাম। ভেবে দেখ্। জোরাজুরির ব্যাপার নেই। কেউ তোর মাল জোর করে কিনতে পারে না। তবে এমন দিন খুব বেশি দূরে নেই যখন তোর অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব পুরনো কাগজের মতো ফেরিঅলাদের কাছে বেচে দিতে হবে। কতো দামে? তিন টাকা কেজি। বড়জোর চার কিংবা পাঁচ। আর এখন? তোর ছেলেমেয়ে তোর বউ আর তুই, পুরো পরিবারের এসব বাড়তি মাল বেচে দিলে কম করে এক কোটি দেবো। মনে রাখিস কড়কড়ে এককোটি টাকা!

সিকান্দার দরোজা পেরিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে মলয় অস্পষ্ট স্বরে বলল—এক কোটি!

সাত

গাড়িতে উঠে আন্তোনিওকে নির্দেশ দিল—নর্থ, এক্সট্রিম নর্থ। কুইক! আন্তোনিও গাড়িতে স্পিড দেয়। মলয়ের পাড়া ছেড়ে গাড়ি বড় রাস্তায় পড়ে। এখন দুপুরের কোলাহলে রাস্তা মুখর। যানবাহনের ভিড় প্রচুর। আন্তোনিও পাকা হাতে ওভারটেক করতে করতে দক্ষিণের পথ ছেড়ে দ্রুতবেগে উত্তরে এগিয়ে চলে।

– আন্তোনিও!

– স্যার?

– আপনি কোন্ দেশের লোক, ইটালি?

– আমার কোনো দেশ নেই। যেখানে শাইলক অ্যান্ড সিকোফ্যান্ট্স্ সেখানেই আমি। পৃথিবীর সর্বত্র আমার দেশ। অন্যভাবে বললে বলা যায়, আমরা, মানে শাইলক অ্যান্ড সিকোফ্যান্টস কোনো দেশের অস্তিত্ব মানি না। যেখানে লাভের সম্ভাবনা আছে, যেখানে টাকা আছে সেখানেই আমরা আছি। সেটাই আমাদের দেশ।

– আপনি চমৎকার বাংলা বলেন। যদিও একটু বিদেশি টান আছে, তবু বলবো, আপনি অনেক বাঙালির চেয়েও ভালো বাংলা জানেন!

– আমি এগারোটা ভাষা জানি। প্রত্যেকটাই মাতৃভাষার মতো ব্যবহার করতে পারি।

– আপনার মাতৃভাষা কোনটা?

– প্রত্যেকটাই আমার মাতৃভাষা!

– আন্তোনিও!

– স্যার?

– একজন মানুষের এগারোটা মা থাকতে পারে না!

– পারে।

– আপনার বস্ মানে, শাইলকের ক'টা মা?

– কুড়িটা। তবে কোম্পানির মা ধরতে গেলে পৃথিবীর সব মাই তার মা। আমাদের কোম্পানিতে এখন পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ এবং গুরুত্বহীন মিলিয়ে মোটামুটি ছ'শর ওপর ভাষায় কাজ করা হয়।

– ছ'শ! বলেন কি?

– আরো শেখানো হচ্ছে। আশা করা যায়, আগামী দু'বছরের ভেতর পৃথিবীতে এমন কোনো ভাষা থাকবে না যে ভাষায় আমাদের কাজ কর্ম চলবে না।

– সে তো হাজার হাজার।

– হ্যাঁ, তাই। তবে একই সঙ্গে অন্য একটা প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে, সেটা অনেক বেশি আধুনিক, বিজ্ঞান-ভিত্তিক প্রচেষ্টা।

– কি রকম?

– পৃথিবীতে মাত্র একটাই ভাষা থাকবে।

– কি ভাষা?

– ইংরেজি।

– তাই নাকি?

– হ্যাঁ, সেই প্রক্রিয়া এমন দ্রুত এবং ব্যাপকভাবে চালানো হচ্ছে, আশা করা যায় আসছে বছর দশেকের ভেতর পৃথিবীর অন্য সমস্ত ভাষাকে বিলুপ্ত করে দেয়া সম্ভব হবে!

– দুটো ব্যাপার তো পরস্পরবিরোধী হয়ে গেল। একদিকে হাজার হাজার ভাষা শিখছেন, অন্যদিকে সমস্ত ভাষা বিলুপ্ত করছেন, কন্ট্রাডিকটারি হয়ে গেল না?

– আপাতদৃষ্টিতে। আসলে দুটোই একটা মূল উদ্দেশ্যের সহায়ক। একটা সূক্ষ্ম নীতির কৌশলগত প্রয়োগ।

– কি সেই নীতি?

– পৃথিবীকে একটা ভাষাভাষী দেশ করে তোলা, পৃথিবীকে একটা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলা। পৃথিবীকে একটা বড় বাজারে রূপান্তরিত করা। পৃথিবীর সমস্ত অনুন্নত এবং বিচ্ছিন্ন সংস্কৃতি ধ্বংস করে একটামাত্র সংস্কৃতির আয়ত্তাধীন করা।

– কি সেই সংস্কৃতি?

– কেনা বেচা!

– মানে?

– ক্রয় বিক্রয়।

– সে তো বুঝলাম। আসল মানেটা কি?

– বাজার।

– কিছুই বুঝলাম না।

– বাজার তৈরি করা। বাজারি সংস্কৃতি তৈরি করা। বাজারি ঐতিহ্য তৈরি করা। বাজারি ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি সবই বাজারের আওতায় নিয়ে আসা। সবই পণ্যের মানে উন্নীত করা। যদি আপনি একবার পণ্যের মানে উন্নীত করতে পারেন, সে বস্তু বা বিষয় আপাতদৃষ্টিতে যতই বিমূর্ত মনে হোক, বাজারে বিক্রি করা সম্ভব।

– সেটা ভাষায় বেলায় খাটে?

– অবশ্যই।

– অসম্ভব। আমার ভাষাকে আমি কিভাবে পণ্য করতে পারি? কিভাবে তার বিক্রি বাটা সম্ভব? কিভাবেই বা মানুষের মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে নতুন ভাষায় তাকে কথা বলাবেন? পৃথিবীকে একটাই ভাষাভাষী দেশে রূপান্তরিত করবেন? এই ভাবনাটাই ইউটোপিয়ান, আজগুবি, অবৈজ্ঞানিক।

– সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক। কারণ বিজ্ঞান ইতিমধ্যেই পণ্য।

– তাই? ব্যাখ্যা করুন।

– আপনার দেশ ক'দিন আগে যে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়, যারা ঘটায়, যারা এর পেছনের কারিগর অর্থাৎ বিজ্ঞানী তাদের আপনারা বাহবা দিয়েছেন, তাদের নিয়ে গর্ব করেছেন এবং করছেন, একথা ঠিক?

– তা ঠিক।

– তাহলে এবার একটু ঠিকভাবে ভাবুন—পরামাণু বোমা একটা পণ্য। এর কারিগরি দিক আপনাকে কিনে আনতে হয়। এর প্রধান যে উপাদান কোনো দেশের হাতে না থাকলে তা কিনতে হয়। তার বাজার দরও আকাশছোঁয়া। তাহলে দেখুন এর গুরুত্বপূর্ণ দুটো দিক—একটা উপাদানগত একটা তত্ত্বগত বা কারিগরি দুটোই কিনতে হয়, দুটোই পণ্য। কোনো কোনো দেশ আবার বানাবার ঝামেলায় না গিয়ে সরাসরি পরমাণু বোমা কিনছে। এখনো খোলাবাজারে না মিললেও গোপনে, চোরাপথে বিক্রি বাটা হচ্ছে। এবার বলুন, বিজ্ঞানের এত বড় আবিষ্কার তা পণ্য হিসেবেই বাজারে বিক্রি হচ্ছে এবং যার যেমন দরকার সে তেমন তেমন কিনছে। এছাড়া বিজ্ঞানের যে কোনো শাখার দিকে তাকান, ফলিত বিজ্ঞান কিংবা বিজ্ঞানের তত্ত্বগত দিক সবই পণ্য, সবই বিক্রয়যোগ্য মাল। জানেন তো, আজকাল থিসিস পেপার বিক্রি হয়, থিম বিক্রি হয়?

– হ্যাঁ, তা শুনেছি। ঠিক আছে, বিজ্ঞান যে পণ্য এটা না হয় মেনেই নিলাম কিন্তু সারা পৃথিবীতে একটাই ভাষা চালু করবেন, ভাষাও একটা পণ্যে রূপান্তরিত হবে, কিভাবে?

– স্যার?

– বলুন।

– আমি মাঝে মাঝে দু'একটা কঠিন শব্দ ব্যবহার করতে পারি? মানে, আমার বক্তব্যের জোরটা ভালোভাবে বোঝাবার জন্যে আর কি?

– বেশ তো, করুন।

– আপনার বাংলা ভাষায় যারা বড় বড় গবেষক, তাত্ত্বিক, পণ্ডিত, মনীষী গোছের—ভাষাবিজ্ঞানী বলতে যাদের বোঝায় আর কি, তারা অনেক কাল আগে থেকেই বিদেশে গিয়ে তাদের মাতৃভাষা শিখে আসতো, তা জানেন?

– হ্যাঁ, সে তো অনেকেই গেছে। এখনো যাচ্ছে।

– তাহলে এবার আমরা একটা সিদ্ধান্ত করতে পারি—আপনার দেশের সেই ভাষাবিজ্ঞানীর দলই আমাদের প্রথম এজেন্ট, মানে দালাল!

– কিভাবে?

– তারাই আপনার ভাষাকে পণ্য করার পথে প্রথমে আমাদের সাহায্য করেছে এবং ধারাবাহিকভাবে এখনো সাহায্য করে চলেছে!

– কিভাবে?

– যে জাতির লোক তার মাতৃভাষা শেখার জন্যে অন্যের দেশে যায়, অপরের দ্বারস্থ হয় তার ভাষা কোনোদিন টিকে থাকতে পারে না। আপনার ভাষাও টিকবে না। আমাদের নির্ভরযোগ্য দালালদের হাতেই আপনারা আপনাদের ভাষার উৎকর্ষের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন।

– বুঝলাম। কিন্তু কিভাবে?

– খুব সহজভাবে। আমরা যেভাবে এইসব ভাষা-দালালদের ভাষার ঘোপ ঘাপ বুঝতে শেখাবো তারা সেভাবেই শিখবে। তারা সেভাবেই শিখে এসে তোতাপাখির মতো আপনাদের শেখাবে। আপনারা তোতাপাখির মতোই একে অন্যকে সেই শেখানো বুলি শেখাবেন। আমরা শেখাবো—ভাষার মূল একটাই, একটাই তার গর্ভাগার; আপনারা শিখবেন একটাই গর্ভাগার। আমরা শেখাবো সমস্ত ভাষার মূলে একটাই জননী-ভাষা, সেই জননী-ভাষার গর্ভ থেকে বহু ভাষার জন্ম হয়েছে। আপনারা শিখবেন, একই জননীর গর্ভ থেকে বহু ভাষার জন্ম হয়েছে। আপনারা শিখবেন, একই জননীর গর্ভ থেকে বহু ভাষার উৎপত্তি ঘটেছে। আমরা শেখাবো, ধ্বনিগত দিক থেকে, মানুষের স্বরক্ষেপণের দিক থেকে মূলত একটাই ক্রিয়া পদ্ধতি রয়েছে। আপনারা শিখবেন—মূলত ক্রিয়া পদ্ধতি একটাই। এবং সব শেষে আমরা শেখাবো—সব যখন একই উৎস থেকে একই পদ্ধতিতে বিস্তৃত হয়েছে তখন বাংলাকে রোমান হরফে লিখতে পারলে সুবিধে অনেক, কম্পিউটারে প্রোসেস করতে সুবিধে বেশি। সুতরাং আপনারা রোমান হরফে বাংলা শিখবেন। তারপর আমরা শেষ বিদ্যেটা শিখিয়ে বলবো—রোমান হরফে আর বাংলার ঝামেলায় গিয়ে লাভ নেই। সরাসরি ইংরেজিটাই ভালো, অনেক বেশি বিজ্ঞান ভিত্তিক। আপনারা শিখবেন—বাংলার চেয়ে ইংরেজি ভাষা অনেক বিজ্ঞানসম্মত। সুতরাং আপনারা এর পর থেকে ইংরেজি শিখতে হামলে পড়বেন। স্যার?

– বলুন।

– আপনারা কি ইংরেজি শিখতে ইতোমধ্যেই হামলে পড়ছেন না?

– তা ঠিক।

– আপনারা ইংরেজি না জানলে কি ম্যাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি পেতে পারেন?

– না সম্ভব নয়।

– আপনারা ইংরেজি না শিখলে সর্বভারতীয় কোনো সংস্থায় চাকরি পেতে পারেন?

– না, সত্যিই মুশকিল।

– হ্যাঁ, এই মুশকিল আসানের জন্যেই বাংলা ছেড়ে ইংরেজি শিখবেন, শিখতে বাধ্য হবেন। আমরা সারা পৃথিবীতে এভাবে প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষাকে ধ্বংস করে ধীরে ধীরে ইংরেজি শিখতে বাধ্য করবো। যারা শিখবে না অথবা শিখতে পারবে না তাদের ভাতে মারবো! আর সব শেষে সহজ সিদ্ধান্ত হলো, যে বিদ্যা আয়ত্ত করলে ঘরে ভাত আসে যে বিদ্যার বিনিময়ে অর্থ আসে সে বিদ্যা অবশ্যই একটা পণ্য। আর তাই একই প্রজাতির ছোট পণ্যকে বড় পণ্য দিয়ে গিলে ফেলা হবে। এবং আপনার ভাষাকে অবশ্যই সংকুচিত করতে করতে কোণঠাসা করতে করতে এক সময় ধ্বংস করে দেবো, তাই অবশ্যই আপনি ইংরেজি শিখতে বাধ্য হবেন এবং অবশ্যই পৃথিবীতে একটা মাত্র ভাষা থাকবে—তার নাম ইংরেজি!

– আন্তোনিও!

– স্যার?

– আপনার কথাবার্তা কর্কশ। নির্মম। আপনি নিষ্প্রাণ, হৃদয়হীন লোকের মতো কথা বলেন।

– শাইলক অ্যান্ড সিকোফ্যান্ট্স-এর চাকরিতে ঢোকার সময় আমার হৃদয় বন্ধক রাখতে হয়েছে!

– সে কি?

– হ্যাঁ। আমার হৃদয় বন্ধক দিয়ে আমি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছি! যেমন আপনি আপনার অতীত অর্থাৎ ঐতিহ্য বিক্রি করে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছেন।

সন্ধ্যার এখনো অনেক বাকি সন্দেহ নেই। তবে রোদের তেজ কমে গেছে। এই দুর্বল রোদ যে বেশিক্ষণ আলো দিতে পারবে না সেটাও নিশ্চিত। বাস রাস্তা থেকে সিকান্দারের বাড়ি হেঁটে গেলে মিনিট পাঁচেক লাগবে। মাটির রাস্তা। দু'এক জায়গায় একটু আধটু গর্তটর্ত আছে। দু একা উঁচু ঢিবিও আছে। গায়ের পথ যেমন হয়। তবে পথটা যথেষ্ট চওড়া। গাড়ি যেতে পারে। ঝকঝকে নতুন গাড়িটা যখন পাকা রাস্তা ছেড়ে সিকান্দারের বাড়ির দিকে ঢুকছে তখন পাকা রাস্তার ধারে ছোট্ট চায়ের দোকানে যারা বসে আড্ডা মারছিল তারা দুচোখ বড় করে গাড়ির দিকে তাকাল। গাড়ি? কার গাড়ি! গাড়িতে কে যায়? এ গাঁয়ের পাশ দিয়ে প্রতিদিন এতো

গাড়ি, এতো ধরনের গাড়ি চলাচল করে যে গাড়ির প্রতি ওদের কৌতূহল নেই। আসল ব্যাপার হলো, নিম্নবিত্ত এই গাঁয়ের ভেতর কখনো গাড়ি ঢোকে না। কেনই বা ঢুকবে? গাড়িঅলাদের সঙ্গে কারই বা যোগাযোগ রাখার সাধ্যি আছে? হ্যাঁ, মাঝে মাঝে বড়জোর দুএকখানা মোটর বাইক আসা যাওয়া করে। অই পর্যন্ত। তার বেশি কেউ কখনো আশাও করেনি, দেখেও নি। সেক্ষেত্রে গাড়ি তাও আবার বিদেশি মডেলের চকচকে ঝকঝকে নতুন গাড়ি! গাড়িতে কে যায়? আরে এ যে সিকান্দার! সিকান্দার গাড়ির পেছনে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে, সামনে ড্রাইভার চালিয়ে যাচ্ছে। উল্টো হলে তবু মানা যেত। সিকান্দার চাকরি বাকরি না পেয়ে গাড়ি চালানো শুরু করেছে। পেছনে বসে আছে গাড়ির মালিক। কোনো কাজে কম্মে এদিকে এসে গেছে বলে মালিককে ভজিয়ে একটু বাড়িতে ঢুঁ মেরে যাচ্ছে। কিন্তু ব্যাপার তা নয়। তাহলে ব্যাপার কি? চল্ দেখে আসি। ছোকরাদের দলটা একটু একটু করে সিকান্দারের বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। ইতোমধ্যে বাচ্চা-কাচ্চার দল গাড়ির সাথে হৈ-হৈ করে ছুটতে আরম্ভ করেছে। বাচ্চাদের হৈ-হৈ শুনে আরো নতুন বাচ্চারা ছুটে আসছে। বাচ্চাদের চেঁচামেচি শুনে বাচ্চার মায়েরা ঘরের কাজ হাতে রেখে মুখ বাড়িয়ে দিচ্ছে। বাচ্চার মায়েদের মুখ বাড়ানো দেখে বাচ্চার বাবা কাকারাও এগিয়ে আসছে। মোটমাট নিঃস্তরঙ্গ গাঁয়ের জীবনে বিপুল এবং সগর্জন তরঙ্গের মতো সিকান্দার গাঁয়ে ঢুকলো।

বাড়ির সামনে বেশ বড়সড় একটা উঠোন। উঠোনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সিকান্দার নেমে এল। ততক্ষণে উঠোনের চারদিকে লোক জমে গেছে। বিশেষত বাচ্চাকাচ্চার দল। সিকান্দারের বাবা খুব সুস্থ নন। হাঁটা চলায় একটু কষ্ট হয়। তিনি বারান্দায় বসেছিলেন। ছেলেকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে চোখ বড় করে সেই যে তাকিয়ে রইলেন তো তাকিয়েই রইলেন আর চোখ ফেলাতে পারছেন না। চোখ ফিরবে কিভাবে? তার কাপড় জামার যা পারিপাট্য তাতে চোখ ফেরানো সম্ভব নয়। কাল রাতে কোন্ সিকান্দার গেল আর কোন্ সিকান্দার ফিরে এল! মাত্র একটাই তো রাত আর একটাই তো দিন! সিকান্দারের মা এক ঝলক তাকিয়ে দেখেই নিজেকে সামলে নিলেন। তাঁর কাছে বড় কথা, বাড়িতে অতিথি এসেছে। অন্তত কিছু আয়োজন আপ্যায়নের ব্যবস্থা তো করতেই হবে। তাঁর কাছে ছেলের ভাগ্য পরিবর্তনের ব্যাপারটা তখনো বড় আকারে দেখা দেয়নি। সিকান্দারের স্ত্রী নিতান্তই যুবতী। তার ভেতরে এখনো এত দুঃখ দারিদ্র্যের পরও আনন্দের ঢেউ ওঠে, দুঃখ ঝড় বয়। আবেগ শুকিয়ে এখনো পাথর হতে পারেনি। স্বামীকে বীরদর্পে নামতে দেখে প্রথমেই তার যা মনে হল, কপাল ফিরে গেছে! কিভাবে ফিরল, কত দ্রুত ফিরল, সম্ভব কি অসম্ভব সেটা বড় কথা নয়। কপাল ফিরে গেছে সুতরাং আনন্দ করো। সে দাওয়ার সামনে একটু এগিয়ে এসে দাঁড়ায়। তার মুখের চাপা হাসির ঝিলিক কিছুতেই সরতে চায় না। আর সিকান্দারের ছেলেমেয়েদের প্রসঙ্গ খুব বড় করে উল্লেখের দাবি রাখে না। অন্যসব বাচ্চাদের

মতোই তারা সিকান্দারের কাছে ছুটে আসে। তবে অন্যেরা সিকান্দারের কাছাকাছি এসে থেমে যায়, ওরা থামে না। নোংরা হাতেই বাবাকে জড়িয়ে ধরে। বিশেষ করে ছেলেটা বয়সে সবার ছোট, এখনো পাঁচ পেরোয়নি, সে বাবাকে সেই যে জড়িয়ে ধরে আছে আর ছাড়ার নাম নেই। মেয়ে দুটো প্রাথমিক আনন্দের রেশ কাটিয়ে বাবার সাথে সাথে মালপত্র গাড়ি থেকে নামায়। ছুটে ছুটে মায়ের পায়ের কাছে জমা করে।

আন্তোনিও ভারি জিনিসগুলো গাড়ির পেছনে থেকে নামিয়ে বারান্দায় তুলে রাখে। সুরাইয়া নিজের আনন্দের অভিঘাত সামলে নিয়ে দামি মালামালগুলো ঘরের ভেতরে ঢোকাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সিকান্দার একটা ক্যাডবেরির টিন খুলে চারপাশে জড়ো হওয়া বাচ্চাদের টফি-চকলেট বিলিয়ে দেয় তার আগেই নিজের ছেলেমেয়েদের হাতে মুখরোচক খাবারের নানান প্যাকেট চলে গেছে। পরিবেশ আনন্দঘন। ঠিক এখন কি করণীয় তা ভাবার আগেই অতি জঘন্য কাপে অতি অখাদ্য চা নিয়ে মা এলেন। ওদের দুজনের হাতে দিলেন। তার সাথে অতি সস্তা টিনের প্লেটে ডিম ভাজা। এবার সিকান্দারের সংকোচ লাগে। আন্তোনিওকে এই কাপ-প্লেটে চা, এই বাজে প্লেটে খাবার দেয়াটা কি ঠিক হচ্ছে? অথচ দেয়া তো হয়েই গেছে, এখন নতুন কাপ প্লেট কোথায় পাবে? প্রায় সবই কেনা হয়েছে শুধু এই কাপ প্লেট জাতীয় ঘরোয়া জিনিস হয়নি। সময় কোথায় পেলাম? তাও যেটুকু যাহোক কেনা হলো। কিন্তু এখন এই বিদেশি লোকটার সামনে লজ্জায় সে মাথা কাটা যায়।

– আন্তোনিও!

– স্যার?

– আমরা খুব গরিব।

– না, স্যার। আপনি বললে, এক্ষুনি গাড়ি নিয়ে বাজার থেকে কাপ প্লেট কিনে আনতে পারি।

এই লোকগুলো প্রায় অন্তর্যামী। কথা বলার আগেই বুঝে যায়। এদের সামনে কি আর লুকোবো? যার সামনে কিছুই গোপন থাকে না তার সামনে লজ্জা পাওয়া অর্থহীন। 'না, এখন থাক্। কাল দেখা যাবে। আপনি চা খেয়ে বিশ্রাম করুন। আমি একটু ভেতরে যাই।'

– ওকে স্যার।

আট

ভেতরে গিয়েও ঠিকমতো আড়াল পাওয়া গেল না। মা-বাবা কিংবা স্ত্রীর সাথে একটু প্রাণ খুলে কথা বলবে, এই হঠাৎ সৌভাগ্যে একটু যে প্রাণ খুলে আনন্দ

করবে সে সুযোগ তাকে দেয়া হলো না। গাঁ-গঞ্জের বাড়িতে তেমন আড়াল এমনিতে থাকে না। তার ওপরে কোঠা বাড়ি নয়, বেড়ার ঘর। ঘরের ভেতরটায় চাল ডাল থেকে শুরু করে সংসারের নানা টুকিটাকি জিনিসে এমন ঠাসাঠাসি যে সেখানে ঢোকাই বিপদ। একটা চৌকি এক সময় ছিল, এখনো আছে কিন্তু এখন সেখানে শোয়ার বালাই নেই। তাই চৌকির ওপরেও সংসারের দরকারি অদরকারি জিনিসে ঠাসা। সেখানে বসার জায়গা নেই। এককালে, বিয়ের ঠিক পরপর কিছুদিন সেখানে তার স্ত্রীকে নিয়ে ঘুমোত সিকান্দার। প্রথম বাচ্চা হওয়ার পর প্রধানত স্ত্রী আর সন্তানই চৌকির দখল নেয়। দ্বিতীয় বাচ্চার পর সিকান্দারের দখল প্রায় হাতছাড়া। তখন তার ঘুমোবার জায়গা হলো বারান্দা। তৃতীয় বাচ্চার পর আর কোনোদিন ভুলেও চৌকিতে ঘুমোবার কথা মনে পড়েনি। ততদিনে সংসারের দায়-দায়িত্ব বেড়ে গেছে। ছেলেমেয়ে একটু একটু করে বাড়ছে, আড়াল কমছে, সংকোচ জড়তা-লজ্জা কমছে, ঘরের জিনিসপত্র বাড়ছে, ফাঁকা চৌকিটা আস্তে আস্তে ভরে উঠছে। চৌকি ধীরে ধীরে মাল রাখার একটা পাটাতনে রূপান্তরিত হয়েছে। ঘরমাত্র একটা। চারপাশে ঘোরানো বারান্দা। বারান্দাতেই শোয়া খাওয়া সব চলে। শুধু দক্ষিণের বারান্দাকে দুপাশ থেকে ঘিরে একটা খোপ মতো করা হয়েছে। যদি কোনো অতিথি আসে বিশেষত বোনেরা যখন তাদের স্বামী সন্তান নিয়ে বেড়াতে আসে তখন তারা অই খোপটা ব্যবহার করে। এখন অই খোপটাই আন্তোনিওর থাকার কাজে লাগাতে হবে। হাজার হোক লোকটা বিদেশী। বড় কোম্পানির চাকুরে। শিক্ষিত দীক্ষিত লোক। তাকে একেবারে নাঙ্গা বারান্দায় ঘুমোতে বলা যায় না। ফলে এমন পরিস্থিতিতে সব দিক সামলে নিতে গিয়ে সিকান্দার আর বাড়ির কারো সাথে মন খুলে কথা বলতে পারে না। এদিকে বাচ্চাগুলো পায়ে পায়ে জড়িয়ে আছে। যেখানে সিকান্দার ওরাও সেখানে। শুধু তাই নয়, গাঁয়ের যারা বন্ধু বান্ধব, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন, তারা ইতোমধ্যেই খবর পেয়ে গেছে। তারা যে যার কাজ ফেলে, কাজ সেরে সিকান্দারের সাথে দেখা করতে আসছে। একজন একজন করে তাদের সংখ্যা বাড়ছে। তারা একসঙ্গে এবং সবাই আলাদা আলাদা ভাবে তাদের নানা প্রশ্ন, নানা পরামর্শ নানা প্রস্তাব দিতে চায়। এরা সবাই দুস্থ দরিদ্র মানুষ। গাঁয়ের একজন যেভাবেই হোক কপাল ফিরিয়ে ফেলেছে তাকে ধরে যদি নিজের কপালটাও ফেরানো যায়। সুতরাং তারা তাদের কথা না বলে উঠবে না। তা সে যতো রাত হয় হোক। সিকান্দার ব্যাপার বুঝে স্ত্রীর হাতে ব্রিফকেসটা দিয়ে বলল—সাবধানে রাখো। সেইসাথে চোখের ইঙ্গিতে বোঝাল, ভেতরে মালকড়ি আছে। সুরাইয়া ব্রিফকেস নিয়ে চৌকির তলাকার অন্ধকারে কয়েকটা হাঁড়ি-কলসির আড়ালে এমনভাবে রাখল যেন সহজে কারো নজরে না পড়ে।

সিকান্দার জামাপ্যান্ট খুলে একটু স্বাভাবিক হয়ে ভেতর বারান্দা থেকে বার বারান্দায় এলো। ততক্ষণে বারান্দায় আর বসার জায়গা নেই। কেউ কেউ

ভেতরের ছোট্ট উঠোনে মাদুর পেতে বসে পড়েছে। এই অবস্থায় কার সাথে কি কথা বলবে? ও একটু ভেবে নেয়। এদেরকে কাজ দিলে কাজ করবে। সবাই কাজ চায়। বেশ, তবে কাজ করুক। আমার হয়ে খাটা খাটুনি করুক। ওরাও পয়সা পাবে আমারও বাড়ির কাজকর্মগুলো গুছিয়ে নেয়া হবে। একা মানুষ কতদিক সামলাবো?

সিকান্দার ভিড়ের ভেতর একটা নজর বুলিয়ে একজন বয়স্ক লোককে কাছে ডাকে। লোকটা রাজমিস্ত্রী। অঞ্চলে মোটামুটি ভালো মিস্ত্রি হিসেবে নাম আছে। বাইরে বাইরে কাজ করে। গাঁয়ে আর কে পাকা বাড়ি বানায়? কার সে ক্ষমতা আছে? ফলে প্রায় সারা বছর তাকে বাইরে বাইরে কাটাতে হয়। ওকে ডেকে সিকান্দার জিগ্যেস করে—মতিন ভাই, এখন বাড়িতে আছো, না বাইরে যাবে?

– আছি কিছুদিন থাকতে হবে। মেয়েটার অবস্থা ভালো না। মাস দুয়েক ধরে জ্বর আর কমছে না। কি যে করি!

– কাজ করবে?

– কেন করবো না? কাজ না করলে খাবো কি?

– সিতেশ সরকারের ভাটায় যাও। মোটামুটি দশ বারো কামরার একটা দোতলা বাড়ির যা ইট লাগে তার বায়না করে এসো। কাল থেকে বাড়ির কাজে লেগে যাও।

– বাড়ির প্ল্যান কই?

– আরে প্ল্যান টেলান পরে হবে, আগে বাড়ি শুরু করো। কাল ভোর বেলা থেকেই লেগে পড়।

– ধুর! তাই হয় নাকি? প্ল্যান ছাড়া বাড়ি হয়?

– হবে। লোক আছে। প্ল্যান আজ রাতেই হয়ে যাবে। তুমি ইট বালি সিমেন্টের ব্যবস্থা করো, আজ রাতের ভেতর। কাল থেকে বাড়ি উঠবে। ব্যস্। আর কোনো কথা নয়। যাও, খাটো, খাও। চিন্তা নেই।

– সিকান্দার পাঁচশ টাকার একটা খোলা বান্ডিল থেকে কুড়িটা নোট আলাদা করে গুণে মতিনের হাতে দেয়। মতিন ভালো করে গুণে দেখে বলে—

– দশ হাজার?

– হ্যাঁ, আপাতত এক হাজার তোমার। বাকি টাকা ইটবালি সিমেন্টের বায়না করো। কাল কিন্তু কাজ শুরু করতে চাই। বুঝলে?

– হয়ে যাবে। তুমি প্ল্যানটা করে ফেল।

– ঠিক হ্যায়। চিন্তা নেই।

মতিনকে বিদায় করে অন্যদের দিকে তাকায়। ওরা সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে। যদি কিছু জুটে যায়। সিকান্দার একটু চিন্তা করে। খবরটা এর মধ্যে রটে গেছে নিশ্চয়। কিভাবে রাতারাতি তার ভাগ্য ফিরে গেছে তার একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দরকার। নইলে সবাই ভাববে চুরি ডাকাতি করেছি। সে ওদের দিকে ফিরে

বলে—একটা বড় কোম্পানির এজেন্সি পেয়ে গেছি। অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছিলাম। আজই সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। অনেক বড় কোম্পানি। সারা দুনিয়ায় ওরা ব্যবসা করে। কোটি কোটি টাকার ব্যবসা। আমি বহু কষ্টে এজেন্সিটা বাগালাম। অনেক ধরপাকড় করে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তবে ব্যাপারটা করা গেল। পয়সা কড়ি ভালোই দেবে। মানে আমার কমিশন। তা তোমরা আমার কাজকর্ম দেখাশোনা করো। আমি ভাবছি এখানেই একটা অফিস খুলে ফেলবো। তোমরা কিছু কাজ কাম পাবে। আমারও দেশের লোকের জন্যে কিছু করার সুযোগ আসবে।

ওর কথায় যে যার জায়গা ছেড়ে ওর দিকে এগিয়ে যায়। কাজ তবে মিলবে! কি কাজ, কেমন কাজ, কোথায় কাজ সে সব পরের কথা। আপাতত বড় কথা কাজ মিলবে। ওদের মুখে আশার আলো ঝল্‌কে ওঠে। যে যার দুঃখ—বেদনা-অভাবের কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে শুরু করে। সিকান্দার এসব ঝামেলা এড়াতে টাকার বান্ডিলে হাত দেয়। সমস্যা হচ্ছে পাঁচশ টাকার নিচের কোনো নোট পকেটে নেই। তাই সই। যারা উপস্থিত ছিল প্রত্যেকে পাঁচশ টাকা করে দিয়ে বলল—কাল সকালে এসে বাড়ির কাজে লেগে পড়। পরে দেখব, কোম্পানির কি কাজে তোমাদের লাগানো যায়।

আপাতত ভিড় কমে। সিকান্দার নিঃশ্বাস নেয়ার একটু ফুরসত পায়। বারান্দার খুঁটিতে গা এলিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকায়। সে দুটো মাঝারি আকারের মোরগ নিয়ে রান্নাঘরের কোণের দিকটায় এগিয়ে যাচ্ছে। তার পেছনে বড় মেয়ে টুনি। তার মানে, রাতে মাংস হবে। হোক। খাসির মাংস আনবে বলে ভাবছিল। তা আজকে মোরগ হোক, কাল খাসি হবে। কিভাবে দুনিয়া বদলায়! কালই সুরাইয়া বলছিল, মোরগ। দুটো বেচে দিয়ে টুনির একটা ফ্রক কিনতে হবে। মেয়েটা বড় হচ্ছে। লজ্জা শরমের বোধ বাড়ছে, এখন ছেঁড়া-নোংরা কাপড় পরে স্কুলে যেতে চায় না। আজকালের ভেতরই মোরগ বিক্রি হয়ে যেত। বিক্রি হওয়া মানে অন্যের ভোগে যাওয়া। অন্যের ভোগের মাল কি চমৎকারভাবে নিজের ভোগে লেগে যাচ্ছে। এই হলো জীবন। কখন যে কার মাল কার ভোগে লাগে! আচ্ছা, আমার অতীত কার ভোগে লাগবে? সে কীভাবে অতীত ব্যবহার করবে? আমার অতীতটাকে এভাবেই জবাই করা হবে?

'সিকান্দার! একটু শোন'। আব্বা গম্ভীর গলায় ডাকলেন। আব্বার এই ডাক ভালো নয়। খুব গভীর বিষয়ে কথা বলার দরকার পড়লে তবেই তিনি এমন ভারি গলায় ডাকেন। আর সবচেয়ে সমস্যার ব্যাপার হলো, ছোটবেলা থেকে যতোবার ওই ডাক শুনে বাবার কাছে গেছে, ততোবারই বাবার কাছে বকুনি খেতে হয়েছে। কিন্তু আজ আবার কি হল? এখনো, আমার এই প্রায় বুড়ো বয়সেও এই ডাক শুনতে হবে! কেন, আবার কি করলাম? 'সিকান্দার'! আরো ভারি আরো গম্ভীর গলার ডাক শোনা গেল।

নয়

সিকান্দার বারান্দা থেকে নেমে আব্বার কাছে গেলে তিনি কোনো কথা না বলে বাড়ির পেছন দিক লক্ষ্য করে হাঁটতে শুরু করলেন। হাঁটতে হাঁটতে ওরা একেবারে বাড়ির সীমানায় এসে দাঁড়ালেন। বাড়ির শেষ প্রান্তে বিল। বিল পেরিয়ে অনেকটা দূরে নদী। নদীর ওপারে গ্রাম। ওদের বাড়ির এই সীমানায় এসে দাঁড়ালে এতটা ফাঁকা জায়গা দেখা যায় বলে কখনো কখনো সিকান্দার এখানে এসে দাঁড়ায়। বিশেষ করে বিকেলে। সূর্যাস্ত দেখা যায়। ছোট বেলায় এটা একা খেলার মত ছিল। সূর্যাস্তের সময় সূর্যের রং ধীরে ধীরে কেমন লালচে হয়ে আসে। সোনালি আভা থেকে ক্রমশ লালচে ক্রমশ লালচে থেকে লাল টকটকে, তারপর ধীরে ধীরে লালচে থেকে কালচে তারপর টুক করে সূর্যটা একসময় ডুবে যায়। এমনও হয়েছে, ও সূর্যের দিকে টানা চোখ রেখে ভাবছে, আজ ঠিক সূর্যের ডুবে যাওয়াটা দেখবোই দেখবো। দেখতে দেখতে একটানা তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কোনো কারণে চোখটা একটু ফিরিয়ে আবার ঘুরে সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখে ততোক্ষণে সূর্যের অর্ধেক নেই, তলিয়ে গেছে। তখন খুব খারাপ লাগত। আজ এতোকাল পরে সেকথা মনে পড়তেই কেমন একটা মিশ্র অনুভূতি হয়। ভালো আবার মন্দও। আনন্দের আবার বেদনার। কেন তা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। হয়তো এমন হতে পারে, স্মৃতি মানেই একই সাথে আনন্দের একই সাথে বেদনার। আচ্ছা স্মৃতি কি অতীতের মধ্যে পড়ে না? অবশ্যই! তার মানে আমার স্মৃতি—'সিকান্দার'!

আব্বা সূর্যের দিকে তাকিয়ে ওকে ডাকলেন। সূর্যের রক্তিমাভা দেখা যায়। একটু পরেই সূর্য অস্ত যাবে। অস্তমিত সূর্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আব্বা আবার ডাকলেন–'সিকান্দার'!

– বলুন। সিকান্দার পেছনে দাঁড়িয়ে সাড়া দেয়। আব্বার কাঁধের দিকটায় ওর নজর পড়ে। শ্যামলা চেহারার মানুষটির কাঁধের রং যেন অদ্ভুত। ফর্সার প্রশ্নই আসে না। কালোও নয়। ঠিক শ্যামলাও নয়। কেমন রক্তিমাভ। সূর্যের রং লেগেছে বলে? না কি মৃত্যুর রং! মৃত্যুর রং বোধহয় এমনই অদ্ভুত, ব্যাখ্যাতীত, অপ্রাকৃতিক, ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু আব্বার ঘাড়ে হঠাৎ মৃত্যুর রং লাগবে কেন? দূর ছাই! যতোসব উদ্ভট ভাবনা।

আব্বা ওর দিকে পেছন ফিরেই প্রশ্ন করলেন—তুমি টাকাটা কোত্থেকে পেলে?

আব্বার এই প্রশ্নের জন্যে সিকান্দার প্রস্তুত ছিল। এই একই প্রশ্নের জবাব তাকে আরো বহুবার দিতে হবে, সে জানে। অন্যদের কি বলবে, তাও মনে মনে রিহার্সাল করে নিয়েছে। দু'একবার ইতোমধ্যে তা বলাও হয়ে গেছে। কিন্তু আব্বার প্রশ্নের জবাবে তা বলা মুশকিল। বলতে পারলে ভালো হতো কিন্তু পারা যাচ্ছে না। সবচেয়ে বড় সমস্যা, মিথ্যে বললে, বানিয়ে বললে, এমন কি সত্যি-মিথ্যের মিশেল দিলেও উনি ধরতে পারেন। সে হবে ভয়ঙ্কর ব্যাপার। উনি যদি একবার বোঝেন,

মিথ্যে বলছি ব্যস্, হয়তো কথাবার্তা বন্ধ করে দেবেন। আর সেই মৌনব্রত, অসহযোগ আন্দোলন যে কতদিন ধরে চলবে কেউ বলতে পারে না। এক আধ বছরও চলতে পারে। এমন লোককে নিয়ে কী যে সমস্যা!

– আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

– আমি একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির...

– ওই গল্পটা আগেই শুনেছি–সত্যি কথা বল!

– আপনি ওটা গল্প বলছেন কেন? যা সত্যি—

– ওটা সত্যি নয়। যা সত্যি তাই বল।

– কি যন্ত্রণা! আপনি আমার কথা বিশ্বাস না করলে...

– ওটা সত্যি নয় তাই বিশ্বাস করছি না।

– আমাকে কথাটা শেষ করতে দেবেন তো, না কি?

– শেষ করো।

– আমি একটা ম্যাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির এজেন্সি নিয়েছি এটা সত্যি।

– কিন্তু এত টাকা কেউ এজেন্টকে রাতারাতি দিয়ে দেয় এটা সত্যি নয়—

– কত টাকা দিয়েছে বলুন তো? আপনি কোনো কিছু না জেনেই আগে ভাগে একটা ধারণা করে বসে থাকবেন?

– বেশ তো, কত টাকা পেয়েছ তুমিই বলো।

সিকান্দার এবার নিজের ফাঁদে নিজেই আটকে গেল 'কতো টাকা দিয়েছে' বলতে সে বোঝাতে চাইছিল, আব্বা যত টাকা ভাবছেন অতোটা নয়। কম। কিন্তু এখন হয় মিথ্যে করে কমিয়ে বলতে হবে। নইলে সত্যিই বলে আব্বার হাজার প্রশ্নের হাজার ব্যাখ্যা করার ঝুঁকি নিতে হয়। তার পরেও তাঁকে আদৌ মূল বিষয়টা বোঝান যাবে কিনা সন্দেহ।

– কি হলো, কথা বল?

– শুনুন। আমি একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির এজেন্সি নিয়েছি এটা সত্যি, বিশ্বাস করুন...

– তুমি পাশ কাটিয়ে যাচ্ছো। কতো টাকা এজেন্সি ক'রে পেয়েছ আগে সেটা বল।

– আপনার মুশকিলটা হচ্ছে এই, আপনি কাউকে কথা বলতে দেন না। নিজের ধারণায় গোঁজ হয়ে বসে থাকেন।

– তার কারণ আমার ধারণা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সত্যি হয়। আর তোমার ক্ষেত্রে ধারণা নয়, আশঙ্কা হচ্ছে।

– কি আশঙ্কা হচ্ছে, সরাসরি বলুন তো?

– তুমি মারাত্মক কিছু করেছ, মারাত্মক অন্যায় কিছু। হয়তো তার চেয়েও বেশি কিছু। আমি সেটাই জানতে চাই।

– বিশ্বাস করুন, আমি কোন অন্যায় করিনি।

– বিশ্বাস করো সিকান্দার, আমি তাই বিশ্বাস করতে চাই! কিন্তু আমি জানি, আমি জানি সিকান্দার, তা সত্যি নয়।

– কি সত্যি নয়?

আব্বা এবার ঘুরে তাকালেন। সিকান্দার চোখাচোখি হতেই চোখ ফিরিয়ে নিল। আব্বার চোখ লাল। লাল কেন? সেই অদ্ভুত রং এর লাল। অপ্রাকৃতিক, অদ্ভুত, ব্যাখ্যাতীত এক বিষণ্নতায় ভরা লাল। এমন লাল কেউ কখনো দেখেনি। একি মৃত্যুর রং, মৃত্যুর?

– তুমি অন্যায় করোনি!

– তার মানে আপনি জোর করে বলবেন, আমি অন্যায় করেছি, তাই তো?

– তুমি এখনো পাশ কাটিয়ে অবান্তর কথার ফুলঝুরি ওড়াচ্ছো। সিকান্দার! আমি তোমাকে জন্ম দিয়েছি। তোমার দুর্বলতা সবলতা আমার জানা। সিকান্দার নামটা রেখেছিলাম এইজন্যে যে আমার সন্তান হবে সমস্ত দুর্বলতার ঊর্ধ্বে। মহাবীর আলেকজান্ডারের মতোই হবে তার সাহস, শক্তি, পৌরুষ। আসলে সেটা আমার প্রথম যৌবনের আবেগের ব্যাপার ছিল। পরে একটু বই পত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করে বুঝলাম, আলেকজান্ডার বীর নয়, চোর। মানে ডাকাত! যে একা একা অন্যের মাল গোপনে আত্মসাৎ করে তাকে বলে চোর। যে সদলবলে অন্যের মাল জোর করে আত্মসাৎ করে তাকে বলে ডাকাত। আর যে ডাকাত একটা দেশ লুট করে তাকে বলে বীর! সিকান্দার, যখন তোমার নামটার ওপর ঘেন্না হল, ততদিনে তোমার নামটা স্কুল কলেজে পাকাপোক্ত হয়ে গেছে। পাল্টাবার আর উপায় রইল না। সবশেষে মনকে প্রবোধ দিলাম, নামে কি আসে যায়, আমার সন্তান হবে সৎ, সাহসী, ঋজু বলিষ্ঠ। কিন্তু এখন বুঝলাম—তোমার নামের মতো তোমার চরিত্রটাও বরবাদ হয়ে গেছে! তুমি আলেকজান্ডারের মতো দেশ লুঠ করার ক্ষমতা পাওনি তাই ছিঁচকে চোর হয়েছ, বড় জোর ডাকাত, খুব বেশি হলে ঠগ, বাটপাড়!

– আপনি যা তা বলতে শুরু করেছেন। না জেনে না শুনে না বুঝে...

– জানাও, শোনাও, বোঝাও। আমি তো ব্যাপারটা বোঝার জন্যেই আপ্রাণ চেষ্টা করছি। বোঝাও।

– আপনি ঠিকমতো বুঝতে পারবেন না বলেই আমি এতোক্ষণ পরিষ্কার করতে চাইনি। বিষয়টা একেবারে আধুনিক...

– সিকান্দার, দুনিয়ায় এমন কোনো বিষয় আছে যা বুঝিয়ে বলতে পারলে বোঝা যায় না? না হয় আমি তোমার মতো বিএ এমএ পাশ নই কিন্তু বুঝিয়ে বললে বুঝবো না এতো নির্বোধ বোধহয় নই।

– মুশকিলটা কোথায় জানেন, পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে...এখন দুনিয়ার প্রায় সব কিছুই কেনাবেচা করা যায়। কেনাবেচা হয়।

– তা বেশ তো। কেনাবেচা করা গেল, তারপর?

– আমি কি বলি—কিভাবে বোঝাই—আমি আমার অতীত বিক্রি করে দিয়েছি।

– কি বিক্রি করেছ?

– আমার অতীত।

– অতীত! তার মানে তোমার ঐতিহ্য, তোমার সংস্কৃতি, তোমার ইতিহাস, তোমার পূর্বপুরুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, তোমার স্মৃতি, তোমার সমস্ত সত্তার তিন ভাগের এক ভাগ।

সিকান্দার আব্বার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল বোকার মতো। অতীত মানে যে এতো কিছু, অতীতের সঙ্গে এত সব বিষয় যে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, অতীত থেকে যে এদের কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করা যাবে না এই প্রথম সে যেন তা বুঝতে পারল। পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করল। সিকান্দারের সমগ্র অতীত যেন পুরো ওজন নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল। এখন অতীত আর আব্বা পরস্পর যেন পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাদের আর আলাদা করা সম্ভব নয়। আব্বাই যেন অতীতের মূর্তি ধরে সিকান্দারের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। সিকান্দারের সেই আশ্চর্য অতীতের চোখের রং লাল, সেই লাল চোখের কোনে যেন হালকা জলের রেখা, সেই হালকা জলের রেখায় যেন মৃত্যুর মাতাল ছায়া। যেন মৃত্যু ছুটছে, ছুটতে ছুটতে কোনো এক দূর অতীতের গহ্বর থেকে নিকট অতীতের দিকে এগিয়ে আসছে। এগিয়ে আসছে কাছে, খুব কাছে। আরো কাছে।

– আব্বা!

– সিকান্দার। তুমি আমাকে বিক্রি করে দিয়েছ!

– কি বলছেন!

– আমি বিক্রি হয়ে গেছি!

– কি বলছেন আপনি?

– তোমার সত্তার তিন ভাগের একভাগ বিক্রি করে দিয়েছ!

– আব্বা!

– তোমার পিতাকে বিক্রি করে তুমি তোমার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছ!

– আব্বা! আব্বা!

– তোমার সত্তার তিন ভাগের এক ভাগ বিক্রি করে তুমি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছ!

– আব্বা!

– কার জন্যে সিকান্দার, কার জন্যে তোমার এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা? নিজের বিক্রিত অস্তিত্বের জন্যে? নিজের অস্তিত্বের খণ্ডিত অংশের জন্যে? কার জন্যে তোমার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা? তোমার সন্তানের বিক্রিত পিতার জন্যে?

– আব্বা! বিশ্বাস করুন...

– তোমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করছি সিকান্দার—তুমি তোমার পিতাকে বিক্রি

করেছ। হায় অভিশপ্ত! যে পুত্র তার পিতাকে বিক্রি করতে পারে সে জারজ! সিকান্দার, আমার সিকান্দার! আমি এক জারজ পুত্রের জন্ম দিয়েছি, যে তার পিতার অস্তিত্বের মূল্যে তার সমস্ত পূর্বপুরুষের অস্তিত্বের মূল্যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে!

দশ

রাতের খাওয়া-দাওয়ার আগে পর্যন্ত পরপর লোক এসেছে। খাওয়ার পরেও দু-একজন এসেছে। সিকান্দার মানসিকভাবে একদিকে যেমন উত্তেজিত, আনন্দিত, অন্যদিকে আব্বার ঝাঁঝাল কথার পর থেকে খানিকটা বিচলিত। কাজটা কি সত্যিই এতটা খারাপ হয়েছে? সত্যিই কি সে তার অস্তিত্বের এত বড় সর্বনাশ ঘটিয়ে ফেলেছে? বিশ্বাস হয় না। আব্বা বোধহয় একটু বেশি ভাবছেন, বেশি রকমের আশঙ্কা করছেন, সন্ধ্যার পর থেকে বহুবার, অন্য কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হচ্ছে। এ এমন এক সমস্যা যা অন্য কাউকে বোঝানো যাবে না। অন্য কারো কাছে প্রকাশ করেও লাভ নেই। কেউ কোনো সুপরামর্শ দিতে পারবে না। এখন আর পরামর্শে কীই বা আসে যায়। যা হবার তা হয়ে গেছে। ওর মানসিক অবস্থা আস্তে আস্তে এমন বিশ্রী অবস্থায় পৌঁছায় যে ভালোভাবে মনের আনন্দ প্রকাশ করতেও আশঙ্কা জাগছে। এক ধরনের ভয়ের অনুভূতি তার সমস্ত সত্তাকে ঘিরে ধরেছে। এই পরিস্থিতিতে ঠিক কিভাবে নিজের মনের শান্তি ফিরিয়ে আনা যায়? সে ব্রিফকেসটা চৌকির নিচ থেকে টেনে বের করে। ঘর প্রায় অন্ধকার। এই অঞ্চলে বিদ্যুৎ এসেছে বহু বছর। টাকার অভাবে বাড়িতে কানেকশান নেওয়া যায়নি। একটা টিমটিমে বাতি জ্বলছে বাইরের বারান্দায়। তার ক্ষীণ আলো একপাশ থেকে কিছুটা ঘরের ভেতর এসে পড়েছে। সে ব্রিফকেসটা ক্ষীণ আলোর কাছে নিয়ে খোলে। কড়কড়ে নতুন টাকার বান্ডিলে হাত বুলায়। সত্যিই ধীরে ধীরে আশঙ্কা কেটে যায়। টাকা মানে সম্পদ, নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি, সুখ, আনন্দ। বেশ কিছুক্ষণ টাকার বান্ডিলে হাত বুলোবার পর আবার আগের প্রশান্তি ফিরে পায়, ধীরে ধীরে তার আত্মপ্রত্যয় বাড়ে। আস্তে আস্তে বাবার কথার যুক্তিকে অযৌক্তিক মনে হয়। অবান্তর ভীতি, দুর্বলের আশঙ্কা, প্রাচীন ধারার একজন মানুষের আধুনিক জীবনের প্রতি অর্থহীন সন্দেহ ছাড়া আর কিছুই নয়। যতোই সে নিজের আস্থা ফিরে পায় ততোই তার বাবার ওপর রাগ হয়। নিজে তো কিছু করলেন না অন্যকেও কিছু করতে দেবেন না। এমন মানুষ সংসারে থাকলে সে সংসারে উন্নতি করা যায়? যাক, যা খুশি ভাবুন, যা ইচ্ছে বলুন। আমি আমার কাজ করে যাব। সিকান্দার এবার নিজের ব্যক্তিত্ব পুরোপুরি ফিরে পেয়ে জোর গলায় হাঁক ডাক করতে থাকে। এখন তার হাঁক ডাকের বিশেষ

দরকার নেই তবু করছে। তার অর্থ, আব্বার কথায় সে যে কর্ণপাত করেনি এটা তাঁকে বুঝিয়ে দেয়া। তাঁকে যে পুরোপুরি অবজ্ঞা করা হচ্ছে এটা তারই প্রকাশ।

রাতে আব্বা ভাত খেলেন না। শরীর খারাপ বলে এড়িয়ে গেলেন। এড়িয়ে গেলেন? সিকান্দার একবার ভাবে, বাবাকে একটু সাধাসাধি করবে। অনেকদিন পর বাড়িতে মাংস হল, উনি মুরগি ভালবাসেন, অথচ অভিমান করে ছুঁয়েও দেখছেন না। ব্যাপারটা খুব খারাপ দেখাচ্ছে। একবার বলতে গিয়েও মুখে আটকে গেল। না, এখন কথা বলায় সমস্যা আছে। একটা কিছু সূত্র ধরে হয়তো উনি পাঁচ কথা শুনিয়ে দেবেন। তাছাড়া বিকেলের অতো সব ঝাঁঝাল কথার পর আর ডাকাডাকি করতে ইচ্ছে করে না। এখন যা খুশি করুন। দুদিন বাদে রাগ কমে যাবে। রাগ কমলে, আসল ঘটনাটা বুঝলে আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠবেন। সেই ভালো, এখন আর এসব ঝঞ্ঝাট ভালো লাগছে না। মা কিংবা সুরাইয়া বিকেলের কথাবার্তা শোনেনি। পিতাপুত্রের সেই উত্তেজিত আলোচনা শোনেনি বলে তারা আব্বাকে সাধাসাধি করেনি। বয়স্ক মানুষ, খেতে না চাইলে জোর করে খাওয়ানো ঠিক নয়। সুতরাং আব্বার খাওয়া হলো না। আব্বার খাওয়া হয়নি বলে সিকান্দারও ভালো করে খেতে পারল না। কোথায় যেন বাধো বাধো লাগে। নাহ! এই অশান্তি থেকে মুক্তির উপায় অন্য কিছু চিন্তা করা।

আন্তোনিওর শোয়ার ব্যবস্থা করে সে বাইরে যায়। উঠোনে পায়চারি করতে থাকে। তার সাথে ছেলে মেয়েরাও আসে। ওরাও আজ উত্তেজিত। নতুন সৌভাগ্যের ছোঁয়ায় ওরা যেন টগবগ করে ফুটছে। সবার গায়ে নতুন জামা। নতুন জামার গন্ধে আর আনন্দে কারো চোখে ঘুম নেই। তিনজনেই বাবার সাথে ঘুরছে। অকারণে বকবক করছে। সিকান্দার তাদের কথা শুনছে। তারও ভালো লাগছে। সন্তানদের মুখের হাসি তার মুখেও ঝলকে উঠছে।

ঘরের কাজ শেষ করে সুরাইয়া নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায়। সেই বিকেল থেকে এত রাত অব্দি সে স্বামীর সাথে ভালো করে দুটো কথা বলার সুযোগ পায়নি। এত লোক, এত কাজ, সে সব সামাল দেবে, না স্বামীকে কাছে ডাকবে? তারও তো নানান প্রশ্ন জেগেছে, নানান স্বপ্ন জেগেছে, ভবিষ্যতের নানা রঙের ছবি তারও চোখে ভাসছে। ভবিষ্যতের ছবি, স্বপ্নের ছবি যদি স্বামীর সাথে ভাগ করে দেখাই না হলো তো সেসব ছবি আর বাস্তব হয়ে উঠবে কীভাবে?

সুরাইয়াকে দেখে সিকান্দার পায়চারি বন্ধ করে। কি ভেবে আবার হাঁটতে হাঁটতে উঠোনের কোণে পুকুর পাড়ের দিকে এগিয়ে যায়। ওরা সবাই তাকে অনুসরণ করে। পুকুর পাড়ে বেশ একটা চাতাল মতন আছে। সময় সুযোগ পেলে এখানে শাক সবজির চাষ করে। গত বছর সুযোগ পায়নি। এবার তাই মাটি শক্ত হয়ে গেছে। ওরা মাঝে মাঝে রাতে ওখানে বসে। খুব গরম পড়লে পুকুর পাড়ের ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে যায়। এছাড়া দুজনের মনের কথা জমে গেলে এখানে এসে হালকা হয়। বারান্দার একপাশে বাবা-মা থাকেন। ছেলেমেয়েরাও বড়

হচ্ছে। তারা বড় হয়ে উঠলেও এখনো একসাথে ঘুমোয়। মনের কথা বলার আড়াল নেই আজকাল। অনেকদিন পর আবার সিকান্দারকে পুকুর পাড়ের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে সুরাইয়া মনে মনে খুশি হয়। যদিও বাচ্চারা সাথে আছে, সবকথা বলাও যাবে না, তবু ভালো লাগে।

ওরা সবাই মাটিতে বসল। ছেলে যীশু বাবার সবচেয়ে কাছে ছিল। সিকান্দার তাকে কোলে তুলে নেয়। মেয়ে দুটো বাবার পাশ ঘেঁষে থাকে। সুরাইয়া একটু পেছনে, সিকান্দারের ডানদিকে বসে।

– কি যীশু, প্যান্ট জামা পছন্দ হয়েছে তো?

– খুব ভালো আব্বু, দারুণ লাগছে। কাল স্কুলের সব্বাইকে দেখাবো। ওরা না, আমার ছেঁড়া জামা দেখে আওয়াজ দিত। কাল সব্বাইকে দেখিয়ে দেব!

– তা একটু দেখাতে হবেই। একটু দেখাদেখি না হলে চলে!

– হ্যাঁ, দেখিয়ে দেখিয়ে পরবো। রোজ একটা নতুন। রোজ নতুন জামা আর কার আছে? বল আব্বু?

– তাই তো। টুনি কিছু বলে না কেন? কিরে টুনি? জামাপ্যান্ট ভালো হয়েছে তো?

বড় মেয়ে টুনি কম কথা বলে। তার আনন্দ চাপা। সে চাপা-আনন্দে বাবার একটা হাত মুঠোর ভেতর নিয়ে চাপা কণ্ঠে জবাব দেয়—

এতোগুলো এনেছ কেন? শুধু শুধু টাকা নষ্ট।

– সে কিরে? এখন থেকেই গিন্নিবান্নিদের মতোন কথা শুরু করেছিস! তুই তো দেখছি আমার মাকেও হার মানিয়ে দিবি।

– জানো আব্বু, আপা তখন থেকেই বলছে, এতগুলোন আনার কি দরকার, পরে তো ছোট হয়ে যাবে। শুধু শুধু একগাদা টাকা গেল।

ছোট মেয়ে মিনি বলল। মিনি চটপটে। কথায় কাজে সমান দক্ষ। টুনি যেমন হিসেবি মিনি তেমন খরুচে। এক টাকা হাত খরচ দিলে দু'মিনিটে শেষ করে এসে বলবে, আরো টাকা দাও। তার চাহিদা প্রচুর। একটু সৌখিন, সাজগোজ ভালোবাসে। পড়াশোনাতেও ভাল। টুনি লেখাপড়ায় মাঝারি, কিন্তু বুদ্ধিতে পাকা। অনেকটা বয়স্ক মেয়েদের মতো ওর কথাবার্তা, চালচলন। যীশু এখনো শিশু। তার ভালোমন্দের বোধ তৈরি হয়নি। ব্যক্তিত্ব গঠনের একেবারে প্রাথমিক স্তরে তার জীবন চলছে। তবে যেটুকু বোঝা যায়, ওর স্বভাব চরিত্র খানিকটা আব্বার মতো। দুজনের মেজাজ মর্জিতেও মিল আছে। একবার গোঁ ধরলে আর রক্ষা নেই। বশে আনা সমস্যা। সিকান্দার মিনির কথায় হাসতে হাসতে বলল—ঠিক আছে, টুনির যখন এত জামা কাপড় ভালো লাগছে না ওর গুলো বরঞ্চ তুই নিয়ে নে। তোর গুলো তো রইলই। কি বলিস?

– পরের জিনিস পরবো কেন? ওর কাপড় ওর যাকে ইচ্ছে দিয়ে দিক। আব্বু, আমি একটা ফ্রক দেখে রেখেছি। ওইটে কিন্তু আমায় কিনে দিতে হবে।

– কোথায়?

বাজারে, নরেন ঘোষের দোকানে, স্কুলে যাওয়ার পথে রোজই দেখি, রোজ দেখি। ওরা ফ্রকটা বাইরে ঝুলিয়ে রাখে। যা দেখতে না, আর তেমনি ডিজাইন! একদম নতুন ধরনের। ওটা কিন্তু আমি কিনবোই কিনবো।

– আচ্ছা, ঠিক আছে, কাল কিনে নিস।

– কাল!

মিনি ছুটে এসে সিকান্দারকে জড়িয়ে ধরে। সে ভেবেছে, এত জামাকাপড় কেনার পর হয়তো আব্বু বলবে, পরে কিনে দেব, নয়তো অন্য কোনো অজুহাত দেখাবে। কিন্তু সে এক কথায় রাজি হওয়ায় মিনি আর আনন্দ চেপে রাখতে পারে না। মিনি আব্বুকে জড়িয়ে ধরেছে দেখে যীশুও জড়িয়ে ধরে। এখন আব্বুকে মিনির খপ্পরে ছেড়ে দেওয়া বিপজ্জনক। যীশুর নিজেরও অনেক পরিকল্পনা আছে। আগে যা চেয়েছে কিছুই পায়নি। এখন মনে হচ্ছে আব্বুর হাতে টাকা আছে, এখন চাইলে দেবে। আগে যা চেয়েছে সেগুলো তো নিতেই হবে, নতুন নতুন আরো নানান জিনিস মাথায় ঘুর ঘুর করছে সেগুলোও কিনতে হবে। সে আব্বুকে জড়িয়ে ধরে কানে কানে ফিস-ফিস করে বলল—আব্বু, আমায় একটা এয়ারগান কিনে দেবে, পাখি মারব। দেবে তো, দিতে হবে কিন্তু...দেবে তো, বলো দেবে?

– আচ্ছা দেব।

– কি বললি?

পাশ থেকে মিনি শোনার চেষ্টা করেও শুনতে না পেরে জিগ্যেস করে। 'তোকে বলবো কেন?' যীশু মিনির কথার জবাব দিয়েই আব্বুকে সাবধান করে—আব্বু বলবে না কিন্তু, একদম না!

– জানি জানি, এয়ারগান। তাইতো?

মিনির কথায় অবাক হয়ে যীশু তার দিকে তাকায়। কি করে বুঝল! তার কাণ্ড দেখে সবাই হেসে ওঠে। সিকান্দার হাসতে হাসতে সুরাইয়াকে জিগ্যেস করে—কি, শাড়ি কেমন হয়েছে বললে না তো? সুরাইয়া কিছু না বলে গোপনে সিকান্দারের উরুতে চিমটি কাটে।

– জানো আব্বু, মা খুব বকাবকি করেছে।

– কাকে?

– তোমাকে।

– কেন?

– তুমি এতোগুলোন দামি দামি শাড়ি কিনে টাকার শ্রাদ্ধ করে দিয়েছ।

মা এসব বলছিল আর খুব বকছিল।

মিনির কথায় সিকান্দার মজা পেয়ে আবার জিগ্যেস করে—একই সাথে বলছিল আর বকছিল? ভারি অন্যায়! একসাথে বকা আর বলা চলবে না, কি বল যীশু?

– তাইতো।

সিকান্দারের প্রশ্নে এবং যীশুর জবাবে আবার সবাই হেসে ওঠে। মিনি বুঝলো, সে একটু ভুল করে ফেলেছে। সে আবার আব্বুকে জড়িয়ে ধরে তার পিঠে পরপর চড় মারতে থাকে। তাকে মারতে দেখে যীশু মিনিকে ধাক্কা মেরে সরাতে চেষ্টা করে। 'এই আব্বুকে মারবি না বলে দিলাম। নিজে ভুল করবে আর ভুল ধরিয়ে দিলে মারবে, সর্!' সিকান্দার হাসতে হাসতে দুজনকে শান্ত করে সুরাইয়ার দিকে ফেরে।

– কি, কথা বলছো না কেন?

– কোথায় পেলে?

– কি?

– কি বলছি ঠিক বুঝেছ।

– আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপে হাত ঘসে!

– ইয়ার্কি না, সত্যি বল, কিভাবে পেলে?

– আব্বাকে সত্যি কথা বলে যা ঝাড় খেলাম, শুধু মারতে বাকি রেখেছেন।

– এবার তোমায় বলে সত্যি সত্যি মার না খাই!

– বাজে কথা বলতে হবে না। সত্যি কি করে পেলে?

– তবে আগে বল, রাগ করবে না?

– তোমার কোনো কাজে আমি বাধা দিয়েছি?

– না, সেকথা না, এটা একটু অন্যরকমের ব্যাপার বলেই ভয় লাগছে।

– তুমি যা করবে তাতেই আমার মত আছে। আমি তো জানি, তুমি খারাপ কিছু করতে পার না।

– সমস্যা তো সেখানেই, কাজটা ভালো না খারাপ তা নিজেই বুঝতে পারছি না।

– আগে শুনি তো।

– আমার অতীত বিক্রি করে দিয়েছি।

– অতীত কি আব্বু? যীশু প্রশ্ন করে। যীশুর প্রশ্নের জবাব দিতে সিকান্দার একটু ভেবে নেয়। ঠিক কিভাবে এই শিশুকে অতীতের বিষয়টা বোঝানো যায়? অথচ না বোঝালে ও ছাড়বে না। যা কৌতূহলী ছেলে, বার বার একই প্রশ্নে উত্যক্ত করে তুলবে। সে সহজ করে বোঝাবার চেষ্টা করে।

– যীশু, তুমি দুপুরে ভাত খেয়েছ?

– হ্যাঁ।

আবার রাতেও খেয়েছ তাই তো?

– হ্যাঁ।

– এখন কি আর দুপুর আছে?

– না।

– বেশ। রাতের খাবার সময় আছে না পেরিয়ে গেছে?

– পেরিয়ে গেছে।

– তবে এবার বুঝে নাও। যে সময় পেরিয়ে যায় তার নাম অতীত।

– তবে তো দুপুর অতীত তাই না?

– ঠিক ধরেছ। দুপুর অতীত। রাতের যে সময়টা ভাত খেয়েছ, সেটাও অতীত।

– তার মানে কাল যে তুমি কলকাতায় গেছিলে সেই কালও অতীত?

– ঠিক। গতকাল অতীতকাল। ঠিক ধরেছ। এবার আগের কথাটা ভালো করে মনে রাখো, যে সময় পেরিয়ে যায় সেটাই অতীত। গতকাল, গত পরশু, গত মাস, গত বছর সবই অতীত। গত মানেই অতীত। ঠিক বুঝলে তো?

– বুঝেছি। আমরা যে ছোট মামার বিয়েতে মামাবাড়ি গেছিলাম, সেটাও অতীত।

– চমৎকার, ঠিক বুঝে গেছে। এই তো বুদ্ধিমান ছেলে!

– আব্বু, তুমি তোমার মামা বাড়ি যাওয়া বিক্রি করে দিয়েছ?

– তা...হ্যাঁ, তা বলতে পারো।

– আমি কিন্তু আমার অতীত বিক্রি করবো না।

– বেশ তো, তোমার অতীত তোমারই থাকবে। বিক্রি করতে হবে না।

– আব্বু, তুমি তবে তোমার স্কুলে যাওয়া বিক্রি করে দিয়েছ?

– হ্যাঁ, তা বলা যায়...

– আব্বু, তুমি তোমার আব্বুর কোলে বসা বিক্রি করে দিয়েছ?

– যীশু, আমার সোনামণি, আমি তাও বিক্রি করেছি।

– আব্বু, তুমি তোমার মায়ের দুধু খাওয়া বিক্রি করে দিয়েছ?

– যীশু...যীশু...আমার সোনামানিক, আমি তাও বিক্রি করেছি।

– আব্বু, তুমি খুব বাজে, খুব বাজে, খুব বাজে! আমি তোমার সাথে আর কথা বলবো না!

যীশু সিকান্দারের কোল থেকে নেমে মায়ের পাশে গিয়ে বসল। সিকান্দার কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বলতে পারে না। মিনি টুনি চুপচাপ বসে আছে। তারা বিষয়টা ভালোভাবে না বুঝলেও কিছু কিছু বুঝতে পেরেছে; তাদের কাছেও ব্যাপারটা ভালো লাগেনি। সুরাইয়া দোটানায় পড়ে। একদিকে স্বামীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস অন্যদিকে যীশুর সহজ সরল সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করাও অসম্ভব। সত্যিই কি কাজটা ভালো হলো?

আকাশে হালকা মেঘের আস্তরণ ছিল। এখন মেঘ কেটে পরিষ্কার আকাশ দেখা যায়। হালকা জোছনার আলো গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ওদের মুখের ওপরে এসে পড়ে। ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। এখন যেন কারো কিছু বলার নেই। অতীত বিক্রির প্রসঙ্গটা যে ভাল নয়, ভালো হয়নি, এটা সবাই যেন বুঝতে পেরেছে। সিকান্দার স্ত্রীর চোখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে পুকুরের জলের

দিকে তাকায়। জলের ওপর মরা জোছনার আলো এসে কেমন এক বিষণ্নতার সৃষ্টি করেছে। সিকান্দার অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে কিছু ভাবে। তারপর বিষণ্নকণ্ঠে জিগ্যেস করে—তুমি রাগ করেছ?

– তোমার সব কাজে আমার সায় আছে। থাকবে।

সুরাইয়ার জবাব পেয়েও সিকান্দার যেন আশ্বস্ত হতে পারে না। সে আবার প্রশ্ন করে—তোমার কী মনে হয়, কাজটা কি খারাপ হল?

– তোমার সব কাজেই আমার সায় আছে।

সুরাইয়া জোর দিয়ে বললেও নিতান্ত জোর করেই কথাটা যে বলা হল এটা বুঝতে সিকান্দারের অসুবিধে হয় না। সেও জোর করে স্বাভাবিক হতে চায়। কিন্তু এই প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাইলেও পারে না। মনে হয়, ব্যাপারটা ভালো করে বোঝানো উচিত। সে তাই ব্যাখ্যা করার ভঙ্গিতে আবার শুরু করে—অতীত, যার কোনো ব্যবহারিক গুণ নেই, যা কোনো কাজেই লাগে না, সেই অতীত বেচে কত টাকা পেয়েছি জানো সুরাইয়া? সুরাইয়া কোনো কথা না বলে স্বামীর দিকে মুখ ফেরায়। সিকান্দার আবার আরম্ভ করে—তোমার আমার জীবন স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে। টুনি-মিনির লেখাপড়া বল, বিয়ে-শাদি বল, কোনো চিন্তা নেই। যীশুর ভবিষ্যৎ বল, আপাতত সে ব্যাপারেও চিন্তা নেই। সব ভলোভাবে মিটে যাবে। এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে? এমনিতে সারা জীবন কি পেয়েছি? তোমার একটা শাড়ি কিনতে প্রাণ বেরিয়ে গেছে। ছেলে মেয়েদের সামান্য জামা কাপড় আর স্কুলের খরচা ঠিক মতো দিতে পারিনি। এই কি জীবন? হাতে-গাঁটে যা ছিল, সব বেচতে বেচতে শেষ করে দিয়েছি। মায়ের সামান্য গয়নাগাটি তাও গেছে। এবার ওই জমিটায় হাত পড়তো। তারপর? তারপর তো ভিটেটুকু বেচে দিয়ে রাস্তায় নেমে যেতে হতো। তার চেয়ে এই ভালো নয়? সুযোগ যখন পেয়েছি, কামিয়ে নিলাম। আরো সুযোগ আছে। তুমি চাইলে তোমার অতীত, তোমার ভবিষ্যৎ সব বেচে দিতে পারি। এত টাকা পাবে, মানে এত বিশাল অংকের টাকা যা তুমি সারা জীবনে কল্পনাও করতে পারনি। এই অবাস্তব জিনিসের বাস্তব মূল্য যে এত বেশি তা আমারও জানা ছিল না। সুরাইয়া!

– বল।

– তুমি তোমার অতীত বেচে দেবে?

– তুমি যা বলবে তাই করবো।

– তুমি পাশে থাকলে সাহস পাই, মনকে বোঝাতে পারি—যা করেছি একসাথে মিলে করেছি, যা পেয়েছি একসাথে পেয়েছি, যদি কিছু হারাবার থাকে দুজনের সমান সমান যেন হারায়। কি বল?

– তুমি যা বল তাই হবে।

– আমি ভাবছি—ভবিষ্যৎ বিক্রি করলে ওরা বোধ করি বেশি টাকা দেবে। যীশুর ভবিষ্যৎ বেচে দেব। ছেলের ভবিষ্যৎ বিক্রি করেই ছেলের ভবিষ্যৎটা পাকা

পোক্ত করবো। দিনকাল খারাপ। দুদিন বাদে গেলে আর তেমন কিছু মিলবে না। যা করার দুএক দিনের ভেতর করতে হবে। সবাই জেনে গেলে এসব মালের দাম আলু পেঁয়াজের দামের চেয়েও কমে যাবে। তুমি যদি বল, যীশুর ভবিষৎ কালই বেচে দিতে পারি। মোটা টাকা হাতে নিয়ে তারপর ওর ভবিষ্যৎ গড়ার কাজে মন দিতে পারবে।

যীশু আবার কৌতূহলী হয়ে ওঠে। আগের প্রতিজ্ঞা ভুলে জিগ্যেস করে—ভবিষ্যৎ কি, আব্বু?

– খুব সোজা। তুমি যে রাতে ভাত খেয়েছ তা অতীত। কাল সকালে যে আবার খাবে সেটাই ভবিষ্যৎ। যে সময় পেরিয়ে গেছে তার নাম অতীত। যে সময় এখনো পেরোয়নি, সামনে আছে, তার নাম ভবিষ্যৎ।

– তার মানে, আমি এয়ারগান দিয়ে পাখি মারবো, তা ভবিষ্যৎ?

– হ্যাঁ ঠিক ধরেছ।

– তার মানে, আমি স্কুলে যাব তা ভবিষ্যৎ?

– ঠিক তাই।

– তার মানে, আমি যে নতুন জামা গায়ে দিয়ে মামা বাড়ি যাবো, তা ভবিষ্যৎ?

– নিশ্চয়।

– আমি যে বড় হবো তাও ভবিষ্যৎ?

– ঠিক।

– না! না! না! আমি আমার বড় হওয়া বেচবো না। আমার ভবিষ্যৎ বেচবো না, বেচবো না, বেচবো না!

যীশু মায়ের পাশ ছেড়ে বীভৎস চিৎকার করতে করতে পুকুরপাড় ধরে উন্মাদের মতো ছুটতে থাকে। ওকে ঝোপঝাড়ের দিকে এত রাতে ছুটে যেতে দেখে সুরাইয়া উঠেই তার পেছনে দৌড়ায়। সিকান্দার হতভম্ব হয়ে কয়েক পলক ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর সেও ওদের পিছু নেয়। ওদের পেছনে ছুটতে ছুটতে সে চিৎকার করে—যীশু! যীশু! যীশু!

বাবা জোর করে এখনই তার ভবিষ্যৎ বিক্রি করে দেবে ভেবে সে আরো জোরে ছোটে। আরো জোরে চিৎকার করে—ভবিষ্যৎ বেচবো না। যীশু! ভবিষ্যৎ বেচবো না! যীশু! যীশু! যীশু! ভবিষ্যৎ বেচবো না বেচবো না, বেচবো না!

এগারো

এত রাতে এমন ভয়ঙ্কর চিৎকারে আশপাশের অনেকের ঘুম ভেঙে যায়। তারা বাইরে এসে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করে। কারো হাতে টর্চ লাইট, কারো হাতে ল্যাম্প, কেউ বা আলোবাতির ঝামেলায় না গিয়ে খালি হাতেই ছুটে আসে।

আন্তোনিও এক হাত জামার তলায় কোমরের কাছে রেখে অন্য হাতে জোরালো টর্চের আলো ফেলে ছুটে আসে। সে সিকান্দারদের কাছে এসে ঘুমজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে—এনি প্রবলেম স্যার?

– নো প্রবলেম, গো অ্যান্ড টেক রেস্ট!

– ওকে স্যার।

আন্তোনিওকে প্রায় ধমক দিয়ে সিকান্দার যীশুর হাত ধরে বাড়ি ফেরে। যিশু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর তখনো বিড় বিড় করে বলছে—বড় হবার ভবিষ্যৎ কিছুতেই বেচবো না—কিছুতেই না!

ভেতরের উঠোনে ঢুকতেই মা আলো নিয়ে এগিয়ে আসেন, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করেন—কি হলো? দাদিকে দেখে যীশু বাবার হাত ছেড়ে তার কাছে দৌড়ে যায়। মা তাঁকে একহাতে জড়িয়ে ধরে আবার জিগ্যেস করলেন—কি হল?

সিকান্দার সংকোচ বোধ করে। বারান্দায় মশারি টানানো। আব্বা মশারির ভেতরে উঠে বসে সিকান্দারের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। তার মানে আব্বার ঘুম ভেঙে গেছে, তার মানে উনি যীশুর চিৎকার শুনেছেন! এবার যেন দ্বিতীয় অপরাধের বোঝা সিকান্দারের ঘাড়ে চাপল। সে তাড়াতাড়ি আব্বার চোখের সামনে থেকে দ্রুত পায়ে বারান্দার অন্যপাশে সরে যায়। যেতে যেতে স্বাভাবিক গলায় বলার চেষ্টা করে—কিছু না, হঠাৎ মনে হয় ভয়টয় পেয়েছে। নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কাছেই বেমানান লাগে। মায়ের কথার জবাবে যা বলল, তার কোনো মানে দাঁড়ায় না। নিজের ওপর রাগ ধরে যায়। সে আর কোনো কথা না বলে অন্যদিকের বারান্দায় পাতা মশারির তলায় ঢুকে পড়ে। তার দেখাদেখি মিনিও ঢোকে। টুনি ঢুকবে কি না ভাবতে ভাবতে ঢোকে না। সে এখন বড় হচ্ছে। তার সম্ভ্রমবোধ বাড়ছে। আজই প্রথম সে বাবা মার বিছানা ছেড়ে দাদির বিছানায় শুতে যায়।

বাইরে জলের শব্দ। সুরাইয়া হাত পা ধুয়ে ঘরে ওঠে। আলো নেভায়। আবার সবাই যে যার মতো শুয়ে পড়েছে। ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়, বাইরের কাউকে বিশেষ কিছু বোঝাতে হয়নি এই যা বাঁচোয়া। এই গাঁ-গেরামের লোকগুলো এমন যে কিছু বুঝবে না জানবে না একটা কিছু অজুহাত পেলেই হলো, সব হুড়মুড় করে ছুটে আসবে। বিরক্তিকর! এই জন্যেই ভদ্দর লোকেরা শহরে থাকে। শহরে কেউ কারো সাতে পাঁচে নেই। মরলে নিজের ঘরে মরে পড়ে থাক্, মরে পচে যা। বাঁচলে নিজের ঘরে বাঁচ, বাঁচতে বাঁচতে ফুলে ফেঁপে ফেটে যা, কেউ বেড়ার ফুটো দিয়ে উঁকি মারার নেই। নাহ্। এর চেয়ে শহরই ভালো। দেখি, একটু গোছগাছ করে শহরেই চলে যাব। সমস্যা হচ্ছে আব্বাকে নিয়ে। উনি কিছুতেই শহরে যেতে রাজি হবেন না, এটা নিশ্চিত করে বলা যায়। বিশেষ করে আজ বিকেলের সেই কথা কাটাকাটির পরে তো আর প্রশ্নই ওঠে না। কি যে করি! এসব পুরোনো ধারার প্রাচীন লোকদের নিয়ে বিষম ঝামেলা, সাথে নিয়ে চলাও যায় না, ছেড়ে যাওয়াও চলে না। অশান্তি আর কাকে বলে!

সুরাইয়া বিছানায় আসেনি দেখে সিকান্দার মশারির বাইরে তাকায়। অন্ধকারের ভেতর গাঢ় অন্ধকারে তৈরি একটা নারীমূর্তির মতো সে বসে আছে। কি ব্যাপার? রাগ টাগ করলো নাকি? সিকান্দার মশারি উঁচু করে তাকায়। ওকে তাকাতে দেখে সুরাইয়া ধীরে ধীরে মশারির ভেতর ঢোকে। নিঃশব্দে শুয়ে পড়ে। এখন মধ্যরাত। চারিদিকে শুনশান নিস্তব্ধতা। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। গ্রামের এই নিস্তব্ধতা ভয়াবহ মনে হয়। বিশেষত একা একা যদি কেউ জেগে থাকে, তার কাছে। পাশে ঘুমন্ত মিনির মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সে হঠাৎ হাতটা সরিয়ে সুরাইয়ার মুখে রাখে। সুরাইয়া যেমন চুপচাপ শুয়েছিল তেমনি শুয়ে থাকে। সিকান্দার তাকে কাছে টেনে আনে। অনেকদিন ওকে কাছে টানা হয়নি। অভাবে অনটনে দুশ্চিন্তায় মনটা এতই বিপর্যস্ত ছিল যে এসব আর মনেও আসেনি। আজ বিকেলে ফিরে সুরাইয়ার সেই হাসিমাখা মুখটা দেখে মনে হয়, আজ ওকে কাছে নেব। কতদিন ওকে পাইনি। আজ পেতে হবে। এখন দুশ্চিন্তা নেই, ভোর ভোর বেরিয়ে যাওয়ার তাড়া নেই। আজ পরিপূর্ণ অবসর, এখন শুধুই বিশ্রাম। বিশ্রাম আর বিশ্রম্ভালাপ। সেই বিকেলের পর যত বার সুরাইয়াকে দেখেছে ততবার কামনা বেড়েছে, ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা বেড়েছে। রাতে যখন পুকুর পাড়ে দুজন পাশাপাশি বসেছিল, তখন ইচ্ছেটা আরো প্রবল হয়। কিন্তু তারপর যীশুর চিৎকারে সব যেন ওলট পালট হয়ে গেল। এখন আবার ধীরে ধীরে সেই উত্তেজনার বোধ একটু একটু করে ফিরে আসছে। অথচ সুরাইয়া শীতল। কিন্তু সুরাইয়ার তো শীতল থাকার কথা নয়। যতবার ওকে কাছে নিয়েছে ততবার, ঠিক তার আগের মুহূর্তে ওর শরীর গরম হয়ে ওঠে। প্রথম দিন তো সিকান্দার রীতিমতো ভয় পেয়ে গেছিল। জ্বরটর নয় তো! জিগ্যেস করলে প্রথমে কিছু বলেনি লজ্জায়। তারপর বহুকষ্টে বোঝা গেল, জ্বর নয়, শরীর স্বাভাবিক আছে। এরপর আস্তে আস্তে লজ্জা কমে, পরস্পরের শরীর-মন কাছাকাছি হয়। পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ পায়। তখন সিকান্দার জানল, প্রতিবার ঘনিষ্ঠ হওয়ার আগে চরম উত্তেজনায় ওর শরীর ওরকম গরম হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, ঘনিষ্ঠ হলে, এসব ক্ষেত্রে সাধারণভাবে পুরুষের ভূমিকা যেমন প্রধান, মূলত পুরুষই সক্রিয় নারীরা নিষ্ক্রিয় থাকে, অন্তত পক্ষে পুরুষের তুলনায় কম সক্রিয়—সুরাইয়া তেমন নয়। তার ভূমিকাও প্রবল, সক্রিয়, সমান সমান। সে কোনো অর্থেই শীতল রমণী নয়। তাহলে এখন অমন চুপচাপ, শান্ত, ঠাণ্ডা, শীতল কেন? সিকান্দার তাকে আরো কাছে টেনে আনে। তার মুখের ওপর থেকে সরিয়ে পিঠে হাত বুলায়, পিঠ থেকে বুকে। বুকের ব্লাউজ খুলে আস্তে আস্তে, অতি কোমল ভাবে স্তনের ডগায় আঙুলের খেলা করে। সুরাইয়ার এই এক আশ্চর্য সম্পদ। নারীর প্রধান সম্পদ সন্দেহ নেই। তিন তিনটে বাচ্চা হবার পরেও ওর স্তন শিথিল নয়, কদাকার মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়নি। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, স্তনের মুখ দুটো এখনো বেরিয়ে আসেনি। বেশির ভাগ মেয়েদের বাচ্চা হওয়ার পর যেমন স্তনবৃন্ত শিথিল হয়ে হতে

হতে কালচে হতে হতে বিশ্রী আকার নেয়, কুৎসিত দেখায়, ওর তেমন নয়। বিয়ের আগেও যেমন ছিল, এখনো প্রায় তেমনি আছে। সিকান্দার ওর স্তনের ডগায় আলতো করে টোকা মারে। পর পর। সুরাইয়াকে উত্তেজিত করার সবচেয়ে বড় কৌশল এটাই। কয়েকটা টোকার পর সে সিকান্দারের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেই পড়বে। কিন্তু আজ সে একেবারে চুপ। শান্ত। শীতল! কেন? সিকান্দার তাকে আরো কাছে টেনে এনে বুকের ওপরে ওঠায়। ধীরে ধীরে শাড়িটা খুলে ফেলে। সায়া ব্লাউজ খোলে। সম্পূর্ণ নগ্ন করে তাকে বুকে রেখে তার পিঠে, পিঠের নিচেয় উরুতে আস্তে আস্তে হাত বুলায়। সুরাইয়া তথাপি শান্ত। অচঞ্চল। সিকান্দার এবার তাকে বুকের ওপর থেকে নামিয়ে আবার তার বুকে হাত রাখে। হাত সরিয়ে আস্তে আস্তে পেটের ওপরে রাখে, একটু একটু করে আঙুলের খেলা করে, তারপর আরো ধীরে, আরো কোমল স্পর্শে তার নাভিমূলে হাত দেয়। হাতটা সচল, সচল তার সমগ্র আঙুল, সে নিম্ন-নাভিমূলের ঘন চুলের ভেতর আঙুলের খেলা করে, ক্রমশ দ্রুত, ক্রমশ জোরে, ক্রমান্বয়ে শক্তি প্রয়োগ করে, ক্রমশ তার শক্তি প্রয়োগের স্পৃহা বাড়ে, আরো কঠিন আরো উগ্র হয়ে উঠতে ইচ্ছে হয়। সে এক ঝটকায় আবার সুরাইয়াকে টেনে বুকের ওপরে তোলে। আশ্চর্য! সুরাইয়া এখনো শীতল। সিকান্দার অনেকক্ষণ তাকে বুকের ওপরে রেখে তার বুকের শীতল স্পন্দন অনুভব করে। তারপর আস্তে আস্তে তাকে বুকের ওপর থেকে নামিয়ে পাশ ফিরে শোয়। সুরাইয়া, আমি অতীত বিক্রি করেছি, বর্তমান তো এখনো করিনি, তবু তুমি কেন এতটা শীতল!

বারো

আরো বহুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে সিকান্দার বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। আজ আর ঘুম আসবে না। সে আব্বার বিছানার দিকে তাকায়। ঘুমিয়ে আছেন। বেচারা! রাগ করে রাতের খাওয়া খেলেন না। বয়স্ক মানুষ, অ্যাসিডের ঝামেলা আছে। সকালে বমিটমি না হয়। কী যে সমস্যায় পড়া গেল! সে ভেতরের উঠোন থেকে নিঃশব্দে বাইরের উঠোনে এল। কে? কে একজন মাথা নিচু করে পায়চারি করছে। মনে হয় খুব চিন্তাগ্রস্ত। ও হ্যাঁ, আন্তোনিও। তাহলে ওরও ঘুম নেই? কি ব্যাপার? সিকান্দার নিঃশব্দে ওর পেছন পেছন খানিকটা এগিয়ে যায়। লোকটাকে সারাদিন ধরে একটা যন্ত্রমানব মনে হয়েছে। ওর সবই যথাযথ, সঠিক। কোনো চিন্তা নেই ভাবনা নেই যেন সদা প্রস্তুত, সব সময় কাজের জন্যে তৈরি। এই ধরনের 'ইয়েসম্যান' রোবট গোছের মানুষের সাথে বেশিক্ষণ থাকলে বিরক্তি আসে। রাগ হয়। অথচ এদের সরানো যায় না। সরানো যায় না কারণ এরা কাজের, দরকারি। হাতের কাছে এরা না থাকলে কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব নয়। হ্যাঁ, মানুষটাকে এখন ঠিক মানুষ

মনে হচ্ছে। একটা মানুষ মাথা নিচু করে কিছু ভাবছে। তার অর্থ তার ভাবনা আছে। যার ভাবনা আছে, ভাবনার ভারে যে ভারাক্রান্ত সেই তো মানুষ।

– আন্তোনিও!

– স্যার?

আন্তোনিও চমকে পেছনে ফিরে ওর কাছে এগিয়ে আসে। একটু যেন লজ্জিত। নাও হতে পারে, হয়তো দেখার ভুল—আন্তোনিও!

– স্যার?

– ঘুম আসছে না?

– নতুন জায়গা তো, ঘুম আসতে দেরি হয়।

– তাছাড়াও আমার বাড়িতে কমফোর্ট নেই। ঠিক আপনাদের রাখার মতো ব্যবস্থা করে উঠতে পারিনি...

– নো প্রবলেম স্যার। ওসব নিয়ে ভাববেন না। আমরা যেকোনো পরিবেশে মানিয়ে নিতে অভ্যস্ত।

আবার সেই 'ইয়েসম্যান' আন্তোনিও। সিকান্দার মনে মনে বিরক্ত হয়। একটু যে মন খুলে কথা বলবে সে উপায় নেই। ইয়েসম্যানদের সঙ্গে কি আর প্রাণের কথা চলে? জানোয়ার! সিকান্দার ওকে পাশ কাটিয়ে একা একা পুকুর পাড়ের দিকে এগিয়ে যায়। এখন আর জোছনার আলো নেই। আবার পুরোপুরি অন্ধকারও নয়। হয়তো আকাশে মেঘ জমেছে। জোছনার আলো, ক্ষীণ আলো মেঘের আড়ালে চাপা আছে। সিকান্দারকে ওদিকে এগিয়ে যেতে দেখে আন্তোনিও তার পিছু নেয়।

– স্যার?

– বলুন।

– আমার কাছে ঘুমের ওষুধ আছে, দেব?

– আপনি খান না কেন?

– খুব দরকার না হলে খাই না।

– আমিও খুব দরকার না হলে খাই না।

– আমার মনে হয়, আপনার দরকার আছে।

– আমার মনে হয়, আপনারও দরকার আছে।

– স্যার, আমি আপনার সহকারী, আপনার ভালোমন্দের দেখভাল করা আমার কর্তব্য।

– আপনি আমার সহকারী, আপনার ভালোমন্দের দেখভাল করা আমার কর্তব্য!

– স্যার, আমি বলতে চাইছি, কাল আপনার অনেক কাজ...

– আমি বলতে চাইছি কাল আপনারও অনেক কাজ!

– স্যার...

- আন্তোনিও!
- স্যার?
- আমি নির্বোধ নই!
- আমিও নির্বোধ নই, স্যার!
- আমি তা জানি, কিন্তু আপনি জানেন না যে আমি নির্বোধ নই মূর্খ নই উজবুক নই মাথামোটা ভাঁড় নই!
- আমি তা জানি স্যার!
- কিভাবে?

আন্তোনিও এবার মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। সিকান্দার তাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভেতরে ভেতরে অকারণে রেগে যায় সে প্রায় ধমকের সুরে জিগ্যেস করে—বলুন কিভাবে?

- স্যার, একজন নির্বোধ একজন নির্বোধকে চিনতে পারে না। কিন্তু একজন বুদ্ধিমান একজন বুদ্ধিমানকে চিনতে পারে।
- কিন্তু একজন হৃদয়হীন একজন হৃদয়বানকে চিনতে পারে না!
- স্যার...
- বলুন।
- পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে হৃদয়হীন। হৃদয় খোয়া যেতে পারে, বিক্রি হয়ে যেতে পারে, মহাজনের ঘরে বন্ধকিতে আটকে যেতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণ হৃদয়হীন কেউ থাকতে পারে না। হৃদয় না থাকলেও হৃদয়ের তন্ত্রীগুলো কাজ করে, কাজ করেই চলে।
- নপুংসকের যৌন উত্তেজনার মতো!
- ঠিক তাই স্যার। তবুও তা উত্তেজনা, নপুংসকের যৌনতার আকাঙ্ক্ষার নাম যৌনতার আকাঙ্ক্ষাই, তার অন্য কোনো নাম হতে পারে না।
- কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয়, আকাঙ্ক্ষার অপচয়।
- তবু তা আকাঙ্ক্ষা, তার চেয়ে এক বিন্দু কম নয়।
- তবু তা অর্থহীন, অদরকারি, সে আকাঙ্ক্ষা সেই নপুংসককে বিপথে চালিত করে তাকে কেবল সর্বনাশের দিকেই ঠেলে দিতে পারে।
- তবু তা আকাঙ্ক্ষা, সর্বনাশের আকাঙ্ক্ষা আকাঙ্ক্ষাই বটে!
- আপনি কি বোঝাতে চান?
- আপনি নির্বোধ নন, স্যার।
- আমি এখন নির্বোধ হতে চাই, আমাকে বুঝিয়ে বলুন।
- স্যার, কোনো বুদ্ধিমান ইচ্ছে করলেও নির্বোধ হতে পারে না।
- আন্তোনিও!
- স্যার?
- কেন আমি আমার অতীত বিক্রি করেছি?

– অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে ।

– না, ধ্বংসের স্বাধীনতার জন্যে!

– হয়তো ধ্বংসের স্বাধীনতা আর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা একদিন সমার্থক হয়ে যেতে পারে ।

– আন্তোনিও!

– স্যার?

– আপনি কেন আপনার হৃদয় বন্ধক রেখেছেন?

– অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে ।

– ধ্বংসের স্বাধীনতার জন্যে!

– হয়তো তাই ।

– কেন আপনি তা করলেন? কেন আপনি আপনার হৃদয় বন্ধক দিলেন?

– কেন আপনি আপনার অতীত বিক্রি করলেন?

– আমার কোনো উপায় ছিল না । বেঁচে থাকার জন্যেই আমাকে আমার অতীত বেচে দিতে হলো ।

– আমার কোনো উপায় ছিল না । বেঁচে থাকার জন্যেই আমাকে আমার হৃদয় বন্ধক দিতে হলো ।

– আপনার উন্নত দেশ, আপনার উন্নত ভাষা, আপনার উচ্চ শিক্ষা, আপনার যোগ্যতা, হৃদয় বাঁচিয়ে রেখেও আপনাকে বাঁচতে দিল না?

– না স্যার । আমার শিক্ষা আমার যোগ্যতা আমার উন্নত দেশ আমার উন্নত ভাষা কিছুই আমাকে হৃদয় বাঁচিয়ে রেখে বাঁচতে দিল না ।

– কোথায় আপনার দেশ?

– পৃথিবীর সর্বত্র আমার দেশ ।

– কোন্ ভাষা আপনার মাতৃভাষা?

– পৃথিবীর সমস্ত ভাষাই আমার মাতৃভাষা ।

– পৃথিবীর সমস্ত পিতাই আপনার পিতা?

এবার আন্তোনিও চুপ করে গেল । তাকে নিশ্চুপ দেখে সিকান্দার আবার চড়া স্বরে প্রশ্ন করে—পৃথিবীর সমস্ত পিতাই আপনার পিতা?

– আমার পিতার নাম শাইলক অ্যান্ড সিকোফ্যান্ট্স্!

– চমৎকার! যে পুত্র তার পিতার কাছে হৃদয় বন্ধক রাখে অথবা যে পিতা তার পুত্রের হৃদয় বন্ধক রাখে তারা দুজনেই জারজ । আন্তোনিও! আপনি আপনার জারজ পিতার জারজ পুত্র!

– অবশ্যই! এখন পৃথিবীতে আর পিতার পুত্রের জায়গা নেই, সবাই জারজ! পরিচিত পিতার পরিচয় আড়াল করতে সকলকেই শাইলকের কাছে ছুটে আসতে হবে । শাইলক সকলের পিতা, সকলের ত্রাণকর্তা সকলের একমাত্র ভরসা ।

– কিন্তু কেন?

– আর কোনো উপায় নেই তাই।

– কেন উপায় থাকবে না?

– উপায় রাখা হবে না তাই থাকবে না।

– তাহলে এটা সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত?

– অবশ্যই।

– তাহলে সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষের পিতৃপরিচয় লুপ্ত করে এক জারজ সভ্যতা নির্মাণের চেষ্টা চলছে?

– চেষ্টা নয়, প্রক্রিয়া নয়, ইতোমধ্যেই সে জারজ সভ্যতা নির্মাণের কাজ শেষ করা হয়ে গেছে।

– তাহলে মানুষের মুক্তির আর কোনো আশা নেই?

– স্যার?

– বলুন।

– আশা-আকাঙ্ক্ষা-কামনা-বাসনা স্বপ্ন সবই বিক্রয়যোগ্য পণ্য! এর সব কিছুই বেচা কেনা শুরু হয়ে গেছে!

– কিন্তু কেন?

– কারণ মানুষের হাতে বিক্রি করার মতো আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

– কিন্তু কেন?

– স্যার?

– বলুন।

– আপনাকে একটা ছোট্ট রিপোর্ট শোনাবো?

– শোনান।

– ১৯৬৫ সালে পৃথিবীর সমস্ত রোজগার, অর্থ, মূলধন, সম্পদ, যাই বলুন তার শতকরা ২.৩ ভাগ ছিল পৃথিবীর দরিদ্রতম বিশ ভাগ লোকের হাতে। তার ওপরের বিশ ভাগ লোকের হাতে ছিল ২.৯ ভাগ। তার ওপরের বিশ ভাগের হাতে ৪.২ ভাগ। তার ওপরের বিশ ভাগের হাতে ২১.২ ভাগ। আর সবচেয়ে ধনী বিশ ভাগ লোকের হাতে ছিল ৬৯.৫ ভাগ। মনে রাখবেন, মাত্র শতকরা কুড়ি ভাগ লোকের দখলে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের ৬৯.৫ ভাগ ছিল। তারপর ১৯৭০ এর রিপোর্ট অনুযায়ী দরিদ্রতম কুড়ি ভাগ মানুষের হাতে রইল ২.২, তার ওপরের কুড়ি ভাগের কাছে ২.৮, তার ওপরের কুড়ি ভাগের হাতে ৩.৯ তার ওপরের কুড়ি ভাগের হাতে ২১.৩ এবং সবচেয়ে ধনীদের হাতে ৭০.৪, লক্ষ করুন, সবচেয়ে ধনী কুড়ি ভাগ লোকের সম্পদ একটু একটু করে বাড়ছে। নিচের ধাপ গুলোর সম্পদ একটু একটু করে কমছে। এরপর ১৯৮০ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী সর্বনিম্ন জনতার হাতে ১.৭ তার ওপরের দলের হাতে ২.২, তার ওপরের দলে ৩.৫, তার ওপরের দলে ১৮.৩ এবং সর্বোচ্চ ধনীদের সম্পদ বেড়ে হল ৭৫.৪ ভাগ। এবার সর্বশেষ তথ্যটা জানাই– দরিদ্রতমদের ভাগের সম্পদ নেমে দাঁড়াল, ২.৩ থেকে

১.৪, তার উপরে ২.৯ থেকে ১.৮ তার ওপরে ৪.২ থেকে ২.১ তার ওপরের ২১.২ থেকে ১১.৩ আর সবচেয়ে ধনী কুড়ি ভাগ লোকের সম্পত্তি বেড়ে ৬৯.৫ থেকে ৮৩.৪ হল।

– তার মানে গরিব লোকেরা আরো গরিব হয়ে যাচ্ছে, নিঃস্ব দুস্থরা আরো নিঃস্ব?

– ঠিক বলেছেন। এবার একটু ব্যাখ্যা দিই—পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী কুড়ি ভাগ লোক মানে আসলে কিন্তু কুড়ি ভাগ নয়। তিনশ ছাপ্পান্নটা পরিবার। বাকিরা এদের পোষ্য অনুগৃহীত স্তাবক—সিকোফ্যান্ট্স্। পৃথিবীর মাত্র তিনশ ছাপ্পান্নটা পরিবার গোটা পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের ৮৩.৪ ভাগ দখলে রেখেছে।

– সত্যিই ভয়াবহ, ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

– আরো একটু ব্যাখ্যার দরকার আছে—এই তিনশ ছাপ্পান্নটা পরিবারের ভেতর সবাই কিন্তু সমান ক্ষমতা ধরে না। এদের ভেতর মাত্র পাঁচ সাতটা পরিবারের হাতেই গোটা পৃথিবীর ভালোমন্দের দায় দায়িত্ব তুলে দেয়া হয়েছে। কিংবা আরো ভালো করে বললে বলা যায়—সাতটা পরিবার—মানে, গ্রেড সেভেন, মানে 'জি-সেভেন'ই সমস্ত পৃথিবীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

– বিস্ময়কর! সত্যিই...

– একটু দাঁড়ান। আর বিস্মিত হবার জন্যে আপনার স্টকে সব সময় কিছু 'বিস্ময়' জমা রাখবেন, কারণ পৃথিবীটা বিশাল। শুনুন, শেষ বিস্ময়কর ব্যাপারটা আপনাকে জানিয়ে দিই—এই জি-সেভেনের ভেতর একজনই মাত্র সত্যিকারের অভিভাবক, সত্যিকারের নেতা অথবা চালক, যথার্থ পিতা—অর্থাৎ পরম পিতা-আব্বা! তার নাম—শাইলক! বাকিরা তার দাসানুদাস, কৃপাপ্রার্থী, স্তাবক, সিকোফ্যান্ট্স্। এই জন্যেই শাইলকের একটা নতুন শাখার নাম হচ্ছে—শাইলক অ্যান্ড ফন্স্। মানে কুকুরের মতো ভক্ত। হচ্ছে, এখনো হয়নি, তবে অল্পদিনের মধ্যেই এই নতুন কোম্পানি বাজারে আসছে। তার পরের কোম্পানিটার নাম হচ্ছে, শাইলক অ্যান্ড স্লেভস। অর্থাৎ শাইলক এবং তার কৃতদাসের দল! তারাই সমগ্র পৃথিবী চালনা করবে। তখন, মানে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি, অর্থাৎ শাইলক পৃথিবীর সম্রাট হিসেবে অভিষিক্ত হবেন। সত্যি বলতে কি, ইতোমধ্যেই তিনি অভিষিক্ত হয়ে গেছেন। এখন শুধু সরকারি ঘোষণা করলেই ল্যাঠা চুকে যায়। এক কথায় বলা চলে, তিনি হচ্ছেন শাইলক দ্য গ্রেট। আপনারা অদূর ভবিষ্যতে আর ভগবান খোদা বা বিধাতার ভরসা করবেন না, কিংবা তার কাছে প্রার্থনা জানাবেন না, তখন বলবেন—শাইলক আমায় রক্ষা করো! শাইলক যারে দেয় তারে ছাপ্পড় ফুঁড়ে দেয়! শাইলক মেঘ দে পানি দে, শাইলক মেঘ দে! রাখে শাইলক মারে কে! এমনি সব নতুন প্রবচনে আপনার ভাষা সমৃদ্ধ হবে। অর্থাৎ শাইলক অমনিপ্রেজেন্ট, অমনিসায়েন্ট অমনিপোটেন্ট! তার হাত থকে কারো নিস্তার নেই।

তের

তখন আকাশে আর হাল্কা আলোর আভাসটুকুও নেই। আকাশ জুড়ে মেঘের ঘনঘটা, অন্ধকার। চারিপাশে ঘন অন্ধকার। সিকান্দার আর আন্তোনিও দুজন ছায়ামূর্তির মতো পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। সব কথা শেষ। সমস্ত প্রশ্ন শেষ। সমস্ত ব্যাখ্যা শেষ। এখন ছায়ামূর্তির মতো ছায়ার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিই বা করার আছে? ঘুম? ঘুম নেই, ঘুম আর আসবে না। বিশ্রামের কাল অতিক্রান্ত। কাজের সময়ও আসেনি। অথবা কর্মের কালও অবসিত। অতিক্রান্ত মানুষের অঙ্গসঞ্চালনের দিন। এখন নিঃশ্চুপ নির্বাক বিস্মিত দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকার কাল। সামনে অনন্ত দাসত্বের যুগ। সেই অন্তহীন দাসত্বের জন্যে এখন প্রস্তুত হতে হবে। পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে জীবনের শেষ, সর্বশেষ শক্তিটুকু সঞ্চয় করে নিতে হবে। কতটুকু? পৃথিবীতে, মানুষের চোখের দৃষ্টিতে, তার বিক্রিত হৃদয়ে, অস্তিত্বে আর কতটুকু শক্তি অবশিষ্ট আছে? ঠিক ততটুকু, যতটুকু থাকলে অনন্তকালের দাসত্বের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত থাকা যায়, অনন্তকাল দাসের জীবন যাপন করা যায়, অনন্তকাল ধরে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ক্রোধ রাগ দ্রোহ চেপে রাখা যায়। এখন নপুংসক পুরুষের কাল। এখন নিষ্ফলা নারীদের যুগ। এখন সঙ্গম নয়, শীতল শিশ্নের প্রহর, ঠাণ্ডা যোনির যাম। বড়জোর নিষ্ফল সঙ্গমের লক্ষ্যহীন শ্রমের সময়, বড়জোর নিষ্কারণ বীর্যের অপচয়।

– আন্তোনিও!

– স্যার!

– তাহলে এখন উপায় কি?

– উপায় একটাই, নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ!

– নিঃশর্তে দাসত্বের প্রার্থনা?

– ঠিক তাই!

– মানুষের ক্রোধ, বিদ্রোহ, বিপ্লব, অভ্যুত্থান...

– সব বিক্রি হয়ে গেছে!

– সব?

– সব! সমস্ত ক্রোধ অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মূল্যে বিক্রি হয়ে গেছে, সমস্ত বিদ্রোহ বিপ্লব অভ্যুত্থান অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বিনিময়ে কিনে নেয়া হয়েছে।

– শাইলক অ্যান্ড সিকোফ্যান্ট্স্...

– ঠিক। শাইলক অ্যান্ড সিকোফ্যান্ট্স্ পৃথিবীর সমস্ত বিপ্লব বিদ্রোহ আন্দোলন গণঅভ্যুত্থান নগদ ডলার দিয়ে খরিদ করেছে।

– তাহলে এখন? আমার যা আছে, সব বেচে দিই?

– অবশ্যই। প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। আজ, এখনই আমি বসকে বলে দিচ্ছি।

– এখন, এই রাতে?

– স্যার, ব্যবসায়ীদের রাতদিন সমান। আমার বস্, অর্থাৎ পরমপিতা সদা জাগ্রত, যখন যেখানে নোটের সম্ভাবনা থাকে তিনি তখন সেখানে থাকেন, যখন যে প্রহরে লাভের খবর আসে তিনি তখন সেই প্রহরেই স্বয়ং খবর শোনেন। তিনি সর্বত্র বিরাজিত–অমনিপ্রেজেন্ট, সর্বজ্ঞ—অমনিসায়েন্ট, তিনি সর্বশক্তিমান—অমনিপোটেন্ট!

– বলুন, আপনার পরম পিতাকে বলুন—আমার অতীত আগেই বিকিয়ে দিয়েছি। এবার বর্তমান ভবিষ্যৎ সত্তা আত্মা স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা কল্পনা কামনা বাসনা সব বিকিয়ে দেব। বলুন, নসীব সিকান্দার তার সর্বস্ব, তার সমগ্র অস্তিত্ব বেচে দিতে চায়।

– চমৎকার! আপনি অবশ্যই নির্বোধ নন বরং প্রাজ্ঞ, পরিণামদর্শী, বিচক্ষণ!

– বলছেন?

– বলছি! অবশ্যই বলছি। এখনো কাগজের দাম মোটামুটি মাঝারি স্তরে আছে। এরপর দ্রুত নেমে যাবে। পৃথিবীতে এত কর্মহীন উদ্বৃত্ত মানুষের দল প্রতিদিন বাড়ছে যে তাদের শুধু দুটো খেতে দিলেই তারা সমুদ্রে সাঁকো বানাবার পরিশ্রমও সাদরে মেনে নেবে। উদ্বৃত্ত মানুষ মানে উদ্বৃত্ত শ্রম, মানে উদ্বৃত্ত ডলারের বান্ডিল। উদ্বৃত্ত ডলারের বান্ডিল মানে এক পর্যায়ে আর কাগজ ছাপিয়ে ডলার বানাবার দরকার পড়বে না। সাদা কাগজের ওপর পরম পিতা শাইলকের স্বাক্ষর ফটোকপি করে বাজারে ছেড়ে দিলেই সেই সাদা কাগজ ডলার হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ, আর কেউ কোনো নোট ছাপাবার অবস্থায় থাকবে না। তাদের সমস্ত ক্ষমতা তার আগেই ছেঁটে দেয়া হবে। তখন ডলার অর্থাৎ পরমপিতার সেই মহান স্বাক্ষর সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে যাবে এবং তখন আপনার ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের মূল্য টন টন ডলারের হিসাবে বিক্রি হলেও এক কেজি মোটাচাল কিনতেই হিমশিম খেয়ে যাবেন। সুতরাং যা পারেন এখনই বেচে কিনে আখের গোছান। নইলে শেষের সেদিন বড়ই ভয়ংকর!

– বেশ, সব বেচে দিলাম। আপনি পরমপিতাকে জানান।

– পরমপিতা সর্বজ্ঞ! তিনি আগেই সব জানতেন। তাই আমার ব্রিফকেসের ভেতর আপনার যাবতীয় কাগজপত্র তৈরি করে দিয়েছেন। আপনি নতুন বাড়ি করবেন, তাও তিনি জানতেন, তার জন্যে যে আপনার অতি দ্রুত বাড়ির নক্সা দরকার তাও তিনি জানতেন। আমার কাছে, গোটা পঞ্চাশেক নক্সা পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনার জমি, পরিবেশ এবং পছন্দ অনুযায়ী আপনি বাছাই করতে পারেন। আপনার ছবি আগেই তোলা হয়ে গেছে। তার প্রচুর কপি আছে, প্রয়োজনে আরো করা হবে। আপনার সমস্ত সম্পত্তির মানে, অবাস্তব সম্পত্তির দরদামও মোটামুটি ঠিক করা আছে। পরম পিতা জানতেন, আপনার সব কিছু বেচে দেয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকবে না, মানে, খোলা রাখা হবে না!

– আমার সমস্ত সম্পত্তি, আই মিন, অবাস্তব সম্পত্তির দাম কত ধরা হয়েছে।

– দশ কোটি।

– দশ কোটি?

– হ্যাঁ, আর একটু বেশি পেতেন যদি গতকালই ডিলটা কমপ্লিট করতেন। আপনি একদিন দেরি করেছেন, একদিনে অর্ধেক লোকসান করেছেন।

– যাকগে, যা পেলাম, যা পাচ্ছি, তাই ঢের।

– নিশ্চয়ই। আগামীকাল সিদ্ধান্ত নিলে দর এরও অর্ধেকে নেমে যেত। মানুষ হুড়মুড় করে পরমপিতার অফিসে হামলে পড়ছে! দাম হু হু করে নেমে যাচ্ছে। সুতরাং যা পেয়েছেন, যেটুকু পেয়েছেন তাও কম নয়।

– হ্যাঁ, ভদ্রভাবে টিকে থাকার জন্যে যথেষ্ট।

– নিশ্চয়। টিকে থাকার জন্যে যথেষ্ট। তবে ভদ্রভাবে কি না সেটা বলা মুশকিল।

– কেন! ভদ্রভাবে নয় কেন?

– আপনার মাল ইতোমধ্যেই বিক্রি হয়ে গেছে। আমার পকেটে মোবাইল ফোন আছে। ফোনে আমাদের নির্দিষ্ট কোড ব্যবহার করার ব্যবস্থা আছে। সেই কোডে আমি ইতোমধ্যে খবর দিয়েছি। ওপাশ থেকে ইতোমধ্যেই খবর এসে গেছে—'ডান'! কাল সকালে আপনার একাউন্টে দশ কোটি জমা পড়বে। অর্থাৎ আপনার বিক্রিবাটা শেষ। কাল শুধু আমার কাছে থাকা ফর্মগুলোয় নাম কা ওয়াস্তে একটু সই সাবুদ করে দেবেন তাহলেই ঝামেলা খতম। কিন্তু যে প্রশ্নটা তুললেন, ভদ্রভাবে বাঁচা—না, স্যার, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি—একজন মানুষ তার অস্তিত্বের সবটুকু বেচে দিয়ে ভদ্রভাবে বাঁচতে পারে না।

– তাহলে?

– তাহলে? স্যার, আমি একটু কঠিন শব্দ ব্যবহার করতে পারি?

– হ্যাঁ, নিশ্চয়।

– কুত্তার বাচ্চার মতো!

– মানে?

– একজন মানুষ তার সর্বস্ব বেচে দিয়ে কুত্তার বাচ্চার মতো অন্যের দয়ার ওপর বেঁচে থাকে!

চৌদ্দ

সিকান্দার! সিকান্দার! মায়ের চিৎকারে সিকান্দারের তন্দ্রার ঘোর ভেঙে যায়। সারারাত ঘুম হয়নি। শেষ রাতে শরীর ক্লান্ত লাগায় আবার বিছানায় ফিরে আসে। বোধহয় ঘণ্টাখানেকও হয়নি তার আগেই মায়ের চিৎকার। এখনো আলো

ফোটেনি। ঝাপসা অন্ধকার। কি হলো? সিকান্দার ধড়ফড় করে উঠে বসে। মায়ের বিছানার কাছে ছুটে যায়। মা ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে জড়িত কণ্ঠে বলেন—তোর আব্বা...

আব্বার মুখের দুপাশে ফেনা গড়িয়ে পড়ছে। শরীরটা কেমন যেন অদ্ভুত রংয়ের মনে হয়। নীলচে? হ্যাঁ নীলচে। সিকান্দার আব্বার বুকে হাত রাখে—ঠাণ্ডা। ততোক্ষণে সুরাইয়া আর টুনি মিনি কাছে এসে কাঁদতে শুরু করেছে। হঠাৎ কি হলো? মুখে গাঁজলা কেন? অ্যাসিড হলে মুখে গাঁজলা ওঠে? অতিরিক্ত গ্যাস কিংবা অ্যাসিডে তো স্ট্রোক হয়। হতে পারে বলে শুনেছি। স্ট্রোক হলে কি মুখে গাঁজলা ওঠে? কে জানে!

সিকান্দার ওদের মুখের দিকে তাকায়। ওরা শোকের প্রথম পর্বের বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কান্না তাই ক্রমশ বাড়ছে। ক্রমশ শব্দ বাড়ছে। চিৎকার বাড়ছে। আশেপাশের বাড়ি থেকে লোকজন ছুটে আসছে। ভিড় ক্রমশ বাড়ছে।

সিকান্দার ভিড়ের ভেতর থেকে উঠে দাঁড়ায়। ধীর পায়ে রান্নাঘরের পেছনে যায়। রান্নাঘরের পেছনের বেড়ায় কীটনাশকের একটা শিশি আটকানো থাকে। পুকুর পাড়ে সবজির চাষ করলে মধ্যে মধ্যে কীটনাশক ছড়াতে হয়। সেজন্যেই কীটনাশকের দরকার। কীট মরলে ফলন বাড়ে। বেশি ফলনের জন্যে বেশি বেশি কীটনাশকের ব্যবহার চলছে আজকাল। ফলনও বাড়ছে ইদানীং। সব ঠিকঠাক চলছে মানতেই হবে। তবে মাঝে মাঝে কীটনাশকের বিষে পোকা মাকড়ের সাথে আরো অনেক কিছুই মরছে। মরছে তার কারণ বিষ শুধু পোকামাকড় নয়, আরো অনেক কিছু মারতে পারে। মারেও। আলো মারে হাওয়া মারে কীটপতঙ্গের চেয়ে বড়সড় প্রাণীও মারে, কখনো কখনো খেতের মালিকও মারে!

সিকান্দার শিশিটার কাছে গিয়ে দেখল, হ্যাঁ, একটু কমে গেছে মনে হয়। এই বছর সবজির চাষ হয়নি। অনেকদিন কীটনাশক ছড়াবার দরকার লাগেনি। আগেরবার ঠিক কতোটা শিশিতে রাখা ছিল পুরো মনে থাকার কথা নয়। তবে একটু একটু ঝাপসা ঝাপসা মনে পড়ছে। না, সত্যিই শিশির বিষ কমে গেছে। হয়তো হাওয়ায়, অনেকদিন পড়ে থাকলে এমনিতেই বোধ হয় একটু একটু করে উড়ে যায়। তাই কি? বিষ কি হাওয়ায় ওড়ে?

সিকান্দার ফিরে এসে আব্বার মুখের দুপাশ ভালো করে মুছে দেয়। এখন আর গাঁজলা নেই। কিন্তু শরীরের নীলচে রঙ কিভাবে মুছে ফেলা যায়? যাবে না। মানুষের শরীর থেকে কিছুতেই নীল রঙ সরানো যাবে না।

পড়শিরা এসে গেছে। কাছাকাছি আত্মীয়স্বজন যারা আছে তারাও খবর পেয়ে এসেছে। এখন আর শোকের কাল দীর্ঘ করে লাভ নেই। তাড়াতাড়ি সৎকারের প্রয়োজন। সিকান্দার চারপাশে তাকায়। আত্মীয়দের মধ্যে যারা বয়স্ক তারা এগিয়ে আসে। যারা উদ্যোগী তরুণ তারা এর মধ্যেই প্রাথমিক আয়োজনে লেগে পড়েছে। বাড়ির উঠোনের একপাশে কাপড় দিয়ে ঘিরে মৃতের

শেষ স্নানের আয়োজন চলছে। এরপর কাফনের কাপড় পরিয়ে দাফন করা হবে।

একটা জীবন—আধুনিক জীবনের পক্ষে বেমানান, ব্যর্থ, অসহিষ্ণু, রাগী এবং অকারণে প্রত্যয়ী একটা মানুষের জীবন তার সমস্ত অস্তিত্ব নিয়ে অতীতের গর্ভে, অন্ধকারে, কবরে নির্বাসিত হবে।

আন্তোনিও নিঃশব্দে সিকান্দারের পাশে এসে দাঁড়ায়। সিকান্দার তার দিকে তাকায়। আন্তোনিও তাকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে চাপাকণ্ঠে বলে—স্যার, কোনো সমস্যা হলে বলবেন।

– কি সমস্যা?

– মানে যে কোনো সমস্যা। আমি আপনার সহকারী। যে কোনো সমস্যায় আমি আপনার সাহায্যের জন্য তৈরি।

– যেমন?

– স্যার, আপনি নির্বোধ নন!

– পরিষ্কার কথা বলুন!

– যদি ডেথ সার্টিফিকেট পেতে কোনো সমস্যা হয়...

– কেন সমস্যা হবে?

– না, মানে, যদি কোনো সমস্যা হয়, তাহলে আমি আপনার পাশে আছি।

– কেন সমস্যা হবে?

– লাশের শরীরের রং নীল!

সিকান্দার গভীর দৃষ্টিতে আন্তোনিওর দিকে তাকায়। তারপর অন্যদিকে ফিরে মাথা ঝাঁকায়। তাহলে কারো কারো দৃষ্টিতে ঠিকই ধরা পড়ে গেছে। সিকান্দার আন্তোনিওর মতো একই রকম চাপাকণ্ঠে—খুব তাড়াতাড়ি সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে। আপনি যা দেখেছেন তা ঠিক নয়। তার কারণ আর কেউ তা এখনো দেখেনি।

– ওকে স্যার। আর কেউ যখন দেখেনি তখন আমিও দেখিনি। তাড়াতাড়ি সৎকারের ব্যাপারে আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি?

– ছেলেদের সাথে হাত লাগান।

– ওকে স্যার!

আন্তোনিও উদ্যোগী তরুণদের দলে ভিড়ে অনেকের কাজ একাই এক হাতে সামলে নেয়। তার কাজের ধরন সুশৃঙ্খল যথাযথ নিখুঁত এবং বিজ্ঞানভিত্তিক। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যে কবর খোঁড়ার কাজসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক ঝামেলা শেষ হলো। এবার জানাজা হবে। কাছাকাছি যারা আত্মীয়স্বজন ছিল তারা আগেই এসে গেছে। একটু দূরে যারা আছে তাদেরও খবর পাঠানো হয়েছে। যারা এখনো পৌঁছাতে পারেনি তাদের বাদ রেখে জানাজার নামাজ পড়া হয়। তারপর মৃতদেহ কবরে দেয়ার পালা। মৃতদেহ বয়ে নেয়ার জন্যে একটা ভাঙা চৌকি যোগাড় করা হলো। চৌকির সামনের দিকে একপাশ সিকান্দার তুলে ধরে। পেছন থেকে অন্য দুজন। আন্তোনিও সিকান্দারের পাশে এসে কাঁধ লাগায়। এই মুহূর্তে আন্তোনিওকে

সিকান্দারের ভালো লাগে। ঠিক আপন ভাইয়ের মতো মনে হয়। না, মানুষটা পুরোপুরি রোবট নয়, হয়তো হৃদয়হীন কিন্তু যেখানে হৃদয় ছিল সেখানকার সব তন্ত্রী এখনো শুকিয়ে যায়নি।

লাশ কবরস্থ করা গেল। যারা সাথে এসেছিল একজন একজন করে তারা ফিরে যায়। দু'একজন আত্মীয়বন্ধু সিকান্দারকে সান্ত্বনা দিতে এসে বোঝে, তার সান্ত্বনার খুব একটা প্রয়োজন নেই। সে যথেষ্ট শক্ত আছে। লাশ কবরে দেয়ার পরে নিকটাত্মীয়দের চরম শোকের একটা পালা আসে। এই শেষ। আর কখনো তাদের প্রিয় মানুষটিকে দেখতে পাবে না। চিরকালের মতো মাটির তলায় মানুষটি বিলীন হয়ে গেল। সব শেষ, এখন শুধুই তার স্মৃতি, এখন তার অস্তিত্বের সবটুকু স্মৃতির ধুলোর আস্তরণে লীন হয়ে গেল। এই বোধ মানুষকে শোকবিহ্বল করে। মানুষ তখন বেদনায়, শোকে ভেঙে পড়ে। সেই সময়ে যারা কাছে থাকে তাদের দায়িত্ব হলো শোকার্ত মানুষটিকে সামলে রাখা। এক্ষেত্রে সিকান্দার যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে। তাকে দেখে মনে হয়, সে যেন কোনো প্রতিবেশীর মৃত্যুতে তার আত্মীয়দের সঙ্গ দিতে এসেছে, তার বেশি কিছু নয়। যারা তখনো তার পাশে ছিল তারাও একে একে ফিরে যায়। সিকান্দার বাড়ির পশ্চিম প্রান্তের সেই মাঠের কাছে এসে দাঁড়ায়। নতুন ধানের গাছে মাঠ গাঢ় সবুজ হয়ে আছে। দূরে, অনেক দূরে নদীর ওপারে গ্রাম। গ্রামটাকে কালচে সবুজ মনে হয়। এখানে গতকাল আব্বা দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখন ছিল সূর্যাস্তের কাল। আব্বা কি অস্তমিত সূর্যের ভেতরে তাঁর আসন্ন মৃত্যুকে দেখেছিলেন? আসন্ন মৃত্যুকে দেখা যায়? অনুভব করা যায়? হয়তো যায়। হয়তো মৃত্যুই তাঁকে আসন্ন অস্তিমের দিকে সবলে টেনে নেয়। সে মৃত্যুর হাতের টান এড়াতে পারে না। পালাতে পারে না। কিন্তু স্বেচ্ছায়? কেন মানুষ স্বেচ্ছায় মরে? এ জীবন মধুর। যতোই বেদনা থাক, যতোই দুঃখ থাক, যতোই দারিদ্র্য থাক জীবন এক আশ্চর্য সম্পদ। তাকে কেউ স্বেচ্ছায় হারাতে চায়? হারাতে পারে? পারে। কেন পারে? তাহলে কী জীবনের মতো মৃত্যুও মধুর? মৃত্যুও কি জীবনের মতোই এক আশ্চর্য সম্পদ? এক অন্তহীন আনন্দের উৎস? তাহলে আর জীবনের জন্যে এতো শ্রম, এতো ঘাম এত যন্ত্রণার কি প্রয়োজন? কেন মানুষ জীবনের জন্যে এতটা প্রাণপাত করে? অর্থহীন। সবই দুর্বোধ্য, অর্থহীন, জটিল। হয়তো সবই অবান্তর। এই জীবন অবান্তর। মৃত্যু অবান্তর। এই জীবন মৃত্যুর মতো জটিল মুহূর্তগুলো অবান্তর।

– স্যার?

– বলুন।

– আমি কি অন্য প্রসঙ্গে একটু আলোচনা করতে পারি?

– কারণ?

– শোক দীর্ঘায়িত না করাই ভালো।

– কে বলল আমি শোকার্ত?

– তাহলে আপনি শোকার্ত নন?

– কে বলল আমি শোকার্ত নই?

– স্যার?

– বলুন।

– আমি আপনার সম্পর্কে একটা মন্তব্য করতে পারি?

– পারেন।

– আপনি একজন বিস্ময়কর মানুষ।

– আপনি তার চেয়েও বিস্ময়কর।

– আমি যতোটা বিস্ময়কর হয়তো তার চেয়ে ঢের বেশি বিভ্রান্ত।

– আমি যতটা বিস্ময়কর তার চেয়ে বেশি বিভ্রান্ত।

– আপনি বিভ্রান্ত হলেও ঋজু, আপনার বিভ্রান্তি সহজে বোঝা যায় না।

– আপনিও তাই।

– স্যার, কোনোভাবেই আমি আপনার সমকক্ষ নই।

– অবশ্যই! কোনোভাবেই আমি আপনার সমকক্ষ নই!

– স্যার?

– বলুন।

– আপনি একজন অসামান্য শব্দরসিক।

– আপনিও তাই। হয়তো আমরা দুজনেই বিস্ময়কর মানুষ। দুজনেই বিভ্রান্ত, বিভ্রান্তি কাটাতে বারবার অর্থহীন শব্দের আশ্রয়ে নিজেদের আড়াল করি। হয়তো আমার দুজনেই জীবনের ভারে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, অসহায়। হয়তো আমরা দুজনেই সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। আন্তোনিও!

– স্যার?

– হয়তো আমরা দুজনেই মৃত্যুর শোকে শোকার্ত। কার মৃত্যুর শোকে নিশ্চয় আপনি তা জানেন?

– নিশ্চয় জানি।

– কার?

– নিজের নিজের মৃত্যুর শোকে আমরা শোকার্ত!

– চমৎকার, আন্তোনিও, চমৎকার!

– কোনটা স্যার, আমরা না আমাদের মৃত্যুর শোক?

– শোকের প্রসঙ্গ থেকে সরে যাওয়া।

– সত্যিই কি শোক থেকে আমরা সরতে পেরেছি?

– অন্তত চেষ্টা করেছি।

– তাহলে এবার অন্য প্রসঙ্গে একটু আলোচনা হোক?

– হোক।

– আপনার অ্যাকাউন্টে আরো এক লক্ষ টাকা কমিশান হিসেবে জমা পড়েছে।

– কিসের কমিশান?

– আপনি একজনকে বসের কাছের পাঠিয়েছেন। তিনি তাঁর নিজের, তাঁর স্ত্রীর, তাঁর দুই সন্তানের অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান সত্তা আত্মা স্বপ্ন কল্পনা বাসনা সব কিছু বিক্রি করে দিয়েছেন।

– আমি তো কাউকে পাঠাইনি। কি নাম তার?

– মলয় মুখোপাধ্যায়।

– আশ্চর্য! ও জানল কি ভাবে? আমি তো ওকে শুধু প্রসঙ্গটা বলেছিলাম, ওকে তো আপনাদের ঠিকানা দিইনি।

– তিনি নিজের গুণেই ঠিকানা যোগাড় করেছিলেন।

– যেমন?

– আপনার ব্রিফকেসের ভেতর টাকার সঙ্গে আমাদের কাগজ পত্রও ছিল। উনি এক পলকের মধ্যেই ঠিকানা দেখে পরে টুকে নিয়েছেন এবং গতকাল আপনি ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের অফিসে যোগাযোগ করেছেন।

– চমৎকার!

– কোন্‌টা স্যার? আপনার কমিশান নাকি আপনার বন্ধুর যাবতীয় অবাস্তব সম্পত্তির হস্তান্তর?

– ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া।

– স্যার, ঘাস যদি খুব লম্বা হয় তাহলে ঘোড়া ডিঙিয়ে খাওয়া অসম্ভব নয়।

– চমৎকার!

– কোন্‌টা স্যার? ঘাস, ঘোড়া নাকি ডিঙিয়ে খাওয়ার সার্থকতা?

– আপনাদের দক্ষতা।

– নিশ্চয় আমরা দক্ষ লোক। এ বিষয়ে কখনো কোনো সন্দেহ করবেন না।

– আপনি এত কিছু জানলেন কিভাবে?

– আমরা দক্ষ লোক, স্যার, আমাদের যে জানতেই হয়।

– মূর্খ!

– কে স্যার, নিশ্চয়ই আমরা নই?

– অবশ্যই নন। আমার বন্ধু। সে মাত্র দশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তার পরিবারের সর্বস্ব বেচে দিল। অথচ আমাকে একবার জিগ্যেসও করল না।

– শুধু তাই নয়, তিনি আপনার প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ চেপে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমার বস ভালো করে চেপে ধরতেই তিনি আপনার প্রসঙ্গ বলতে, মানে সবিস্তারে বলতে বাধ্য হয়েছেন। তবে তিনি বার বার আপনাকে বিষয়টা না জানাতে অনুরোধ করেছেন।

– এবং আপনারা তার বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। চমৎকার!

– কোনটা স্যার, আপনার বন্ধুর অনুরোধ না আমাদের বিশ্বাসঘাতকতা?

– দুটোই! কারণ দুটোই বিশ্বাসঘাতকতা!

– নিশ্চয়। পেশাগত দিক থেকে আমরা উভয়পক্ষই সমান সৎ। মানে, আপনার বন্ধু এবং আমাদের শাইলক অ্যান্ড সিকোফ্যান্ট্স্, আমাদের উভয়ের পেশা ব্যবসা অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকতা! সেক্ষেত্রে, অর্থাৎ পেশাগত দিক থেকে আপনার বন্ধু এবং আমাদের কোম্পানি উভয়েই সততার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছে একথা আপনাকে মানতেই হবে!

– নিশ্চয়। আপনারা উভয়েই সৎ-বিশ্বাসঘাতক!

– ধন্যবাদ স্যার! আপনার যথার্থ মূল্যায়নের জন্যে আপনাকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হবে।

– যাই হোক, আমার সৎ-বিশ্বাসঘাতক বন্ধু একদিক থেকে রক্ষা পেয়েছে, তার রান্না ঘরের পেছনে ঝোলানো পেস্টিসাইড নেই এবং তার বাবা জীবিত নন।

– তার পুত্র এখনো জীবিত স্যার!

– তার মানে? আপনি কি বলতে চান?

– আপনি নির্বোধ নন, স্যার!

– তার অর্থ...

– আমাদের পরম পিতার রাজত্বে কোনো পিতা কিংবা কোনো পুত্র নিরাপদ নয়!

– তার অর্থ...

– তার অর্থ সমস্ত অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ সংকুচিত করে, ধ্বংস করে, আমাদের পরম পিতা শুধুমাত্র একটি অস্থির বর্তমান তৈরি করতে চান! যে বর্তমান, যে ভয়ংকর অস্থির বর্তমান কেবল তাঁরই অঙ্গুলি হেলনে ওঠ্বস করবে!

– আন্তোনিও!

– স্যার?

– সমস্ত অতীত ধ্বংস করে সমস্ত ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে শুধুমাত্র এক ভয়ংকর বর্তমান দিয়ে আপনার পরম পিতা কি করবেন?

– ওঠ্বস করাবেন!

– আর?

– ডান বাম করাবেন!

– আর?

– আর সমস্ত অস্থির বর্তমানটাকে নিংড়ে চুষে ছিবড়ে করে ফেলবেন!

– আর?

আর শতকরা ৮৩.৪ ভাগকে ১০০ ভাগে উন্নীত করবেন!

– আর এ বিশ্বের সমস্ত সম্পদের সবটুকু নিজের ভাগে এনে ভাগহীন দুর্ভাগা মানুষদের ইচ্ছেমতো ওঠ্বস করাবেন!

– তারপর?

– তারপর, ইচ্ছে মতো অণুবোমা পরমাণু বোমার নির্ভেজাল পরীক্ষা চালাবেন। এবং প্রতিটি পরীক্ষার কেন্দ্র হবে কোটি কোটি অসহায়, দুঃস্থ অভুক্ত মানুষের ঘন বসতিপূর্ণ শহর বন্দর কিংবা লোকালয়।

– তারপর?

– তারপর, এইভাবে, অতিদ্রুত আমাদের পরমপিতা পৃথিবীকে ভারমুক্ত করবেন!

– চমৎকার!

– কোন্‌টা স্যার, আমাদের পরমপিতা নাকি ভারমুক্ত পৃথিবী?

– পৃথিবীকে ভারমুক্ত করার পরিকল্পনা!

পনের

সিকান্দার কবরখানা থেকে বাড়ি ফিরে দেখে পুকুর পাড়ের চাতালে লরির পর লরি এনে ইট ফেলছে, বালি ফেলছে, পাথর কুচি ফেলেছে মতিন। তার মানে বাড়ির কাজ শুরু হবে। মতিন করিৎকর্মা লোক। এক রাতের ভেতর প্রায় শ'দুয়েক লোক যোগাড় করে ফেলেছে। তারা অধিকাংশ রাজমিস্ত্রির যোগানদার কিংবা অন্য ধরনের ছোটখাটো কাজে লাগবে। সিকান্দার একবার ভাবে, আজ এসব ঝামেলা বন্ধ করে দেবে। পরে ভাবে, কাজের ভেতরে থাকলে দুশ্চিন্তা কমে যাবে, মনের অস্থিরতা দূর হবে। এই ভালো, কাজ চলুক। ব্যস্ততা ভিড় এতো লোকের কথাবার্তার শব্দে নিজেকে ভুলিয়ে রাখা সহজ হবে। সুতরাং সিকান্দারের পকেটের টাকার বান্ডিল মতিনের পকেটে যেতে থাকে এবং মতিনের পকেট থেকে জড় হওয়া লোকেদের পকেটে। হাঁক ডাক চিৎকার চেঁচামেচি এমন শুরু হয় যে রীতিমতো বাজার বলে ভুল করা যেতে পারে। একটু আগে কবর খোঁড়ার কাজে যারা প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল এবার তারা নতুন বাড়ির ভিত গড়তে নতুন গর্ত খোঁড়া শুরু করে। বাড়ির প্ল্যানের সমস্যা নেই। আন্তোনিও জায়গা দেখে, জায়গা মেপে, সবচেয়ে সুবিধেজনক এবং সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন একটা প্ল্যান মিস্ত্রির হাত ধরিয়ে দেয়। মিস্ত্রি তার কাজ শুরু করে। অস্বাভাবিক দ্রুত বেগে বাড়ি উঠতে থাকে।

প্রথমে আব্বার মৃত্যু তারপর বাড়ি বানাবার হৈ চৈ এমনভাবে শুরু হয় যে কেউ কোনো ব্যাপারে বিশেষ নজর দেয়ার সময় পায় না। শোক দুঃখের ব্যাপার ভুলে যার যার সামর্থ্য মতো বাড়ির কাজে সাহায্য করতে লেগে যায়। বাড়িতে এতো লোক জমে গেলে বাড়ির মেয়েদের ঝামেলা বেড়ে যায়। এটা দাও ওটা দাও তো আছেই সেই সাথে এটা নেই সেটা নেই। অথচ বাড়িতে বলতে গেলে কিছুই নেই। তাই বার বার দোকানে পাঠানো বাজারে পাঠানো বার বার সিদ্ধান্ত পাল্টানো, নতুন সিদ্ধান্ত করা। এক কথায় সে এক বিদঘুটে কাণ্ড শুরু হয়। ওসবের ফাঁকে কেউ

কিছু খেয়াল করেনি। করার সুযোগও ছিল না। হঠাৎ যীশুর খোঁজ পড়তে জানা গেল, যীশু নেই। যীশু নেই মানে? সকাল বেলায় দাদুর লাশের পাশে বসে ফুঁপিয়ে কাঁদল, দাদুর লাশের সাথে সাথে কবরের কাছে গেল, তারপর হঠাৎ কোথায় হাওয়া? কাছে পিঠে আছে। দেখ, ভালো করে দেখ, চারিদিকে ছোট! যে যার কাজ ফেলে যীশুর খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। আন্তোনিওর গাড়িতে লোক পাঠিয়ে কাছে দূরে যে সব আত্মীয়স্বজনের বাড়ি আছে সর্বত্র খোঁজ নেয়া হলো। কোথাও যীশু নেই। অনেকের সন্দেহ হতে, পুকুরে এক দেড়শ লোক নামিয়ে পুকুর তছনছ করে ফেলল। কোথাও তাকে পাওয়া গেল না; কিন্তু যাবে কোথায়? কিছু একটা ভেবে কিংবা মনের দুঃখে বাস রাস্তায় গিয়ে কোন বাসে উঠে পড়েনি তো? সুতরাং আবার চারপাশে লোক পাঠানো হলো। আন্তোনিওর গাড়ি প্রায় সারাদিন পইপই করে আশেপাশের বিস্তৃত এলাকা চষে ফেলল, থানায় খবর গেল, কাছে পিঠের হাসপাতালে খবর নেয়া হলো কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। জলজ্যান্ত ছেলেটা এতো লোকের চোখের সামনে দিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল? কোথায় যেতে পারে? কতদূরে যেতে পারে?

সন্ধ্যার পর সবাই ক্লান্ত হয়ে সিকান্দারের সামনে জড় হয়। আন্তোনিও ক্লান্ত দেহে গাড়ির বনেটে বসে আছে। তার মাথা মাটির দিকে। তাকে গভীর চিন্তাগ্রস্ত মনে হয়। অন্যেরা, তারা সংখ্যায় এতো যে বসার জায়গা নেই, সিকান্দারের চার পাশে জড় হয়েছে। সিকান্দার কি করবে বুঝতে না পেরে ওদের ব্যর্থ সন্ধানের বিস্তৃত বর্ণনা পরপর শুনে যায়। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? এক সময় রাত হয়, রাত বাড়ে। যে যার বাড়ি ফেরে। এখন বাড়ির লোকেরা ছাড়া আর কেউ নেই। এখন কিভাবে নিজের মুখোমুখি হবে? কিভাবে স্ত্রীর মুখোমুখি হবে, কিভাবে মায়ের? মা সেই সকাল থেকে যে বিছানা নিয়েছেন আর ওঠেননি। কেউ কিছু জিগ্যেস করলেও কিছু বলছেন না। কারো কথাও শুনছেন না। এই আর এক বিপদ। এখন মাকে বাঁচানোই তো দায়। এদিকে সুরাইয়া এতো স্বাভাবিক, এতো স্বাভাবিকভাবে সব কিছু তদারকি করছে যে সে আর এক ভীতিপ্রদ ব্যাপার। সিকান্দার কয়েকবার তার কাছে কিছু একটা জিগ্যেস করতে গিয়েও অমন অস্বাভাবিক রকমের স্বাভাবিক মূর্তি দেখে আর সাহস করেনি।

এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে কিভাবে কে কাকে সামাল দেবে? মেয়ে দুটো এতো বাচ্চা যে তাদের নিজেদের শোকতাপ সামলে নিয়ে অন্যকে সামলে দেয়ার বয়েস হয়নি। তারা দুজন বিচ্ছিন্নভাবে এদিক সেদিক ঘুরছে, কখনো বাবার কাছে, কখনো মায়ের পাশে কখনো দাদির বিছানার পাশে। তারা যে কি করবে কি করা উচিত এসব তারা নিজেরাও জানে না। গোটা পরিবার বিধ্বস্ত। সংসার বিপর্যস্ত। এখন সিকান্দার কি করবে? কি করতে পারে? কি তার করা উচিত?

অনেকক্ষণ আগে লোকজন চলে গেছে। বাইরের বারান্দায় সিকান্দার একা বসেছিল। বাইরের উঠোনে গাড়ির দরোজা খুলে আন্তোনিও বসে আছে। এখানে অন্ধকার। দুজনে দুজনের কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও কেউ কারো সাথে কথা বলেনি।

কি বলবে? এখন আন্তোনিওর সাথে আর কি কথা বলার আছে? সে তার সাধ্যমতো ঘুরেছে। সারাদিন আশাপাশ চষে ফেলেছে। তার কলকাতার অফিসে ফোনে কথা বলেছে। তাদেরকেও খোঁজ খবর করতে বলেছে।এছাড়া আর সে কি করতে পারে? সে জাদুকর নয়, হারিয়ে যাওয়া যীশুকে হঠাৎ হাওয়া থেকে বের করে আনতে পারে না।

সিকান্দার বাইরের বারান্দা ছেড়ে ভেতরের বারান্দায় গেল। মেয়ে দুটো কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে। মা ঘুমিয়ে আছেন না জেগে আছেন তা বোঝা যায় না। সেই সকাল থেকে একইভাবে শুয়ে আছেন। মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ না হলে ভাবতে হতো মারা গেছেন।

সিকান্দার ওপাশের বারান্দায় গেল। সেদিকে একা সুরাইয়া বসে আছে। ঘরের ভেতরে একটা টিমটিকে আলো জ্বলছে। সে আলোর সামান্যতম বিন্দুও এদিকে আসছে না। অন্ধকারে নিশ্চল মূর্তির মতো সুরাইয়া শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সিকান্দার তার পাশে বসে জড়ানো গলায় ডাকে—সুরাইয়া! সুরাইয়া মুখ ফেরায়। কিছুক্ষণ সিকান্দারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। অন্ধকারে কেউ কারো মুখের রেখা পড়তে পারে না। সিকান্দার আবার ডাকে—সুরাইয়া!

– বল

সুরাইয়ার কণ্ঠস্বর আশ্চর্য রকমের স্বাভাবিক। এমন অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তার এমন স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে সিকান্দার চমকে যায়। ওর কি হল? এত স্বাভাবিক কেন? কোনো তাপ উত্তাপ নেই কেন? সে নিজের বিস্ময়ের ঘোর কাটাতে অকারণে আবার ডাকে—সুরাইয়া!

– বল।

– এখন কি করি? কোথায় যাই? কোথায় যীশুকে পাই!

– তাকে আর কোনোদিন পাওয়া যাবে না।

– কেন, কেন? কি হয়েছে?

– সে চলে গেছে!

– কোথায়? তুমি কিভাবে জানলে? কোথায় গেছে? সুরাইয়া, সে কোথায়?

– জানিনে।

– তুমি যে বললে চলে গেছে, কোথায় চলে গেছে, কার সাথে গেছে, বল, আমায় বল, আমার কাছে লুকিয়ে রেখ না, বল, বল, দোহাই বল।

– জানিনে!

– সুরাইয়া! সত্যি কথা বল, দোহাই!

– সকালে উঠেই বিড়বিড় করছিল—আমার বড় হওয়া বেচবো না, কিছুতেই আমার ভবিষ্যৎ বেচবো না, চলে যাব, পালিয়ে যাব... ভবিষ্যৎ বেচবো না।

– কোথায় যেতে পারে বল তো? মনে হয় ভয় পেয়ে গেছিল।

– ভয় তো পাওয়ারই কথা। ও ভয় পেয়ে গেছিল। আব্বা ভয় পেয়ে

গেছিলেন। ওরা ভয় পেয়ে যে যার মতো চলে গেল। শুধু তুমিই ভয় পাওনি।

– সুরাইয়া, আমি কি সত্যিই কোনো অন্যায় করেছি? সত্যি কথা বল।

– জানিনে।

– না, না, সুরাইয়া সত্যি বল, ওরা কেন ভয় পায়? ওদের কিসের ভয়? আমি তো আছিই। দায়িত্ব আমার। যা কিছু করেছি, সবটাই আমার দায়িত্বে করেছি। তবু ওরা কেন ভয় পায়?

– জানিনে।

– সুরাইয়া, আমি কি সত্যি কোনো অন্যায় করেছি?

– আমি সত্যিই জানিনে।

– আমি কার জন্য এসব করেছি? ওদের জন্যই তো করেছি। ব্যাংকে টাকা জমা আছে। কত টাকা ভাবতে পারো? এগারো কোটি। এগারো কোটি টাকা দিয়ে পুরো অঞ্চল কিনে ফেলা যায়। এত টাকা থাকতেও আমি নিঃস্ব হয়ে গেলাম। কি হবে এ টাকা, কার ভোগে লাগবে, কে খাবে?

– ব্যাংক খাবে, ব্যাংকের ভোগে লাগবে।

– সুরাইয়া, ওভাবে কথা বোলো না। যা বলার সোজাসুজি বল, বল, আমি কি অন্যায় করেছি?

– জানিনে। আমি শুধু জানি, কোথাও একটা গোলমাল হয়ে গেছে, বড় গোলমাল, খুব মারাত্মক রকমের একটা কিছু।

– আমিও জানিনে। যে জীবন হাতে ছিল সেটা কোনো জীবন নয়। পশুপাখির জীবনের চেয়েও খারাপ, পশুপাখির জীবনের চেয়েও নোংরা, দিন আনা দিন খাওয়া কোনো মানুষের জীবন হতে পারে না।

– এখন যে জীবনটা হাতে এল সেটাও কি মানুষের জীবন?

– জানিনে।

– কেন জানো না? তুমি না জানলে কে জানবে? জানার দায়িত্ব তোমার!

– আমার? শুধু আমার?

– তোমার। শুধু তোমার।

– কেন? শুধু আমার কেন? আমি কি নিজের জন্যই এতোসব করলাম? শুধু আমার জন্যই? বল, আমি কি শুধুই আমার...

– তুমি শুধুই তোমার!

– কি বলতে চাও?

– যার জীবন তার!

– একথা তুমি বলতে পারলে?

– পারলাম।

– কি করে পারলে?

– পারলাম এই জন্যে—তুমি নিজের জীবনের বোঝা অন্যের ওপর চাপিয়ে

দিয়েছ।

– কিন্তু অন্যের জীবনের দায় আমার ওপর এসে পড়লে?

– সেটা দায়, বোঝা নয়, যদি কেউ দায়িত্বকে বোঝা মনে করে তবে তার দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া উচিত!

– সুরাইয়া! কি বলছো তুমি?

– যা সত্যি তাই বলছি।

– যা সত্যি তাই! তোমাদের জন্যে প্রাণপাত করেও একথা শুনতে হলো! হায়...

– হাই শাইলক বল!

– সুরাইয়া, তুমি কি শাইলককে জানো?

– আমি তোমাদের সব কথা শুনেছি।

– আমাদের সব কথা শুনে বুঝতে পেরেছ?

– আমি কম লেখাপড়া জানতে পারি, নির্বোধ নই।

– না, তুমি নির্বোধ নও, আব্বা নির্বোধ ছিলেন না, যীশু নির্বোধ ছিল না, আন্তোনিও নির্বোধ নয়, শাইলক নির্বোধ নয়, শুধু আমিই নির্বোধ!

– ঠিক তাই!

– কেন আমি নির্বোধ, কিভাবে আমি নির্বোধ?

– নিজের জীবনের ভার যে টাকার বান্ডিলের ওপর চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায় সে নির্বোধ। সবচেয়ে বড় নির্বোধ!

– হায় সুরাইয়া, তোমার কাছেও একথা শুনতে হল!

– তুমি এমন কথা আরো শুনবে, আরো কিছু দেখবে কিন্তু কিছুই বুঝবে না। নির্বোধ অনেক কিছু শোনে অনেক কিছু দেখে কিন্তু কিছুই বোঝে না।

– আমায় বোঝাও, বুঝিয়ে দাও।

– নির্বোধকে বোঝালেও বোঝে না।

– সুরাইয়া। হায় সুরাইয়া!

– সব খোয়াবার পর হায় হায় করা ছাড়া নির্বোধের আর কিছুই করার থাকে না। যাও, চিৎকার কর, যত জোরে পারো এখন হায় হায় করো। হায় হায় করতে করতে তোমার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ ভেঙে দাও। ভেঙে খান খান করে দাও!

– সুরাইয়া, আমি পাগল হয়ে যেতে চাই। মরে যেতে চাই।

– মরার আগে তোমার বাবার মৃত্যুর হিসেব মিটিয়ে যাও। তোমার ছেলের মৃত্যুর হিসেব মিটিয়ে যাও।

– ছেলের মৃত্যু! কি বলছো তুমি?

– যে ছেলে আর কোনোদিন ফিরে আসবে না সে মৃত। তার মৃত্যুর জন্যে তুমিই দায়ী। তুমি! আমার ছেলের মৃত্যুর হিসেব দাও!

– সুরাইয়া!

– দূর হও! মরে যাও! মরে যাও!

– আমি...আমি...

– তুমি মৃত। তোমার বাবার সাথে তোমার জানাজা হয়ে গেছে! যাও কবরে যাও!

সিকান্দার বারান্দা থেকে ঝাঁপ দিয়ে উঠোনে নামে। ছুটে যেতে গিয়ে নিজের পায়ে জড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তারপর কোনোক্রমে উঠে দাঁড়ায়। বিড় বিড় করতে করতে বলে—মরবো। মরে যাব, সেই ভালো। পেছন থেকে সুরাইয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে—মরার আগে ছেলের মৃত্যুর হিসেব মিটিয়ে যাও।

– সুরাইয়া, আমি কোথায় তোমার ছেলেকে পাব? আমার নিজের মৃত্যু দিয়ে তোমার ছেলের মৃত্যুর ঋণ শোধ করে দেব।

– তার আগে তোমার বাবার মৃত্যুর ঋণ শোধ করে যাও।

– আমার নিজের মৃত্যু দিয়ে বাবার মৃত্যুর ঋণ শোধ করে যাবো।

– নির্বোধ! উন্মাদ! চোর! একটা মৃত্যু দিয়ে তুমি দুই দুটো মৃত্যুর ঋণ শোধ করবে? তোমার টাকার বান্ডিল দিয়ে আরো একটা 'তুমি' বানাও। তারপর দুজনে মরো। দুজন মরেই দুটো মৃত্যুর ঋণ শোধ দাও।

– সুরাইয়া!

– নির্বোধ কখনো মরে না। যুগ যুগ নির্বোধ বেঁচে থাকে। নিজে বেঁচে অন্যকে মারে। তোমার মরণ নাই। বাঁচো! বেঁচে থাকো! মরণের অধিক জীবন নিয়ে খাবি খাও!

– আমায় বল, বলে দাও, আমায় দিশা দাও...বল আমি কি করবো?

– টাকার বান্ডিলে হাত বুলাও!

– বান্ডিল পুড়িয়ে দাও!

– পারবে না। আর পারবে না। একবার নরম হাতের ছোঁয়া পেলে সে বান্ডিল আর কখনো পোড়ে না। সে শুধু পোড়ায়, জ্বালায়, জ্বালিয়ে সবকিছু ছারখার করে দেয়।

– কেন, কেন? কেন?

– লোভ! লোভ! লোভ!

– কিসের লোভ?

– তোমার সর্বগ্রাসী অর্থনৈতিক স্বাধীনতার লোভ!

ষোল

সিকান্দার টলতে টলতে উঠোন ছেড়ে পেছনের জংলা পথ ধরে কবরখানার দিকে এগিয়ে গেল। কোনো উদ্দেশ্য নেই, কোনো কাজ নেই, এই যাওয়ার অর্থ নিজেকে সচল রাখা। সে যে এখনো মৃত নয় জীবিত এ শুধু তারই প্রমাণ। কিন্তু এই প্রমাণে

আর কার প্রয়োজন? তার নিজের? সে অন্ধকারে গাঁয়ের ঝোপ ঝাড় পেরিয়ে, লতাপাতা মাড়িয়ে শেয়ালের মতো নিঃশব্দে কবরের কাছে গেল। যতই নিঃশব্দে হেঁটে যাক তবু তার পায়ের আওয়াজ পেয়ে কারা যেন কবরের কাছ থেকে দৌড়ে পালায়। কারা? কবরের কাছে এতো রাতে কারা? শেয়াল। কবরের মাটি খুঁড়ে লাশ তুলে নিতে চায়। কিন্তু মাটির নিচে বাঁশের পাটাতন শক্ত করে পুঁতে দেয়া আছে। তার নিচে গর্তের ভেতরে লাশ। শেয়াল মাটি খুঁড়তে পারলেও পাটাতন আলগা করতে পারবে না। হয়তো পারবে না। তবু চেষ্টা করে যেতে হবে। জীবন এমনি কঠিন, খাবারের যোগান দেয়া এতোই জটিল যে চেষ্টা চালিয়েই যেতে হবে। বার বার ব্যর্থ হলেও চেষ্টার ত্রুটি রাখলে চলবে না। যদি একটু একটু করে পাটাতন সরিয়ে ফেলা যায়। যদি মজুদ খাবারের ভাঁড়ার লুট করা যায়। লুট! লুট করা অন্যায় নাকি ন্যায়? যার ঘরে সঞ্চিত খাবার আছে তার আরো খাবার মজুদ করা নিশ্চয় অন্যায়। কিন্তু যার ঘরে শুধুই সঞ্চিত আছে নগ্ন দুহাত, শুধুই নগ্ন দুহাত, খাবারের কণামাত্র ঘরে নেই, তার পক্ষে লুট করা অন্যায় না কি ন্যায়? শেয়াল, হায় শেয়াল! তোমার যাবতীয় ধূর্ততা নিয়েও তুমি অন্নের সংস্থান করতে পারো না। কেন তুমি তবে পরমপিতা শাইলকের দ্বারস্থ হবে না? কেন তুমি তোমার শেয়াল-জীবনের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ বিক্রি করবে না? তবু তো শেয়াল তার অতীত বিক্রি করে না। তবুতো শেয়াল তার আত্মা কারো কাছে বন্ধক রাখে না। মানুষ শেয়ালের চেয়ে বড় না কি শেয়াল মানুষের চেয়ে বড়? কে কার চেয়ে বড়? হায় ধূর্ত শেয়াল, তুমি পরম পিতা শাইলকের দরবারে কোনো দিন যাবে না। কোনোদিন তাকে তুমি চিনবে না। কোনোদিন সত্তা-আত্মা আর আকাঙ্ক্ষা তুমি কারো কাছে বিকিয়ে দেবে না। প্রতিদিন খাবারের সন্ধানে বনে বনে ঘুরবে। যেদিন পাবে সেদিন খাবে যেদিন পাবে না সেদিন খাবে না, দিন আনা দিন খাওয়া হায়রে দরিদ্র শেয়াল, অর্থনৈতিক স্বাধীনতাহীন হে শ্বাপদ, তোমার জীবন জীবনের মতো কষ্টকর, হয়তো জটিল, হয়তো নির্মম। তবু তুমি অর্থনৈতিক স্বাধীনতাহীন নিরঙ্কুশ স্বাধীন। তোমাকে তোমার পুত্রের মৃত্যুর দায় কাঁধে নিয়ে ঘুরতে হয় না। তোমাকে তোমার পিতার মৃত্যুর দায় কাঁধে নিয়ে অন্ধকারে, ঘোর অন্ধকারে পশুর মতো জীবনের খোঁজে ঘুরতে হবে না। সিকান্দার কবরের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ কবরের ভেতর থেকে উঠে এল যীশু! যীশুর শরীর ইতোমধ্যে পূর্ণবয়স্ক মানুষের মতো পরিণত হয়েছে। সে ভারি গলায় জিগ্যেস করল—কি চাই?

তাই তো, কি চাই? আমি এখন কার কাছে কি চাই? আমি এখানে কেন এসেছি? জীবনের খোঁজে বেরিয়ে আমি মৃত্যের রাজ্যে কেন এলাম? কবরের কাছে আমার কি কাজ? এখানে কি জীবন আছে? নাকি আমি মৃত্যুর খোঁজে বেরিয়ে এসেছি? তাহলে কি জীবন খুঁজতে খুঁজতে আমি ভুল করে মৃত্যুর খোঁজ করছি? আমার কি চাই? জীবন না মৃত্যু? যীশু আবার জিগ্যেস করে—কি চাই?

– যীশু, আমি তোমার আব্বু, আমি তোমাকে দেখতে এসেছি।

– মৃতের সাথে জীবিতের কোনো সম্পর্ক নেই।

– যীশু, আমি তোমার ভবিষ্যৎ বিকিয়ে দিইনি। ঘরে চল। ঘরে চল যীশু, তোমার মা তোমার জন্যে অস্থির।

– মৃতের সঙ্গে জীবিতের কোনো সম্পর্ক নেই!

– যীশু আমার যীশু, আমি তোমার সত্তা, আত্মা অতীত ভবিষ্যৎ কিছুই বিক্রি করিনি। তোমার জীবন তোমারই আছে। ঘরে চল।

– আমার জীবন আমি ঘরে ফেলে এসেছি। এখন আর আমার কোনো জীবন নেই। আমার আর জীবনের দরকার নেই।

– তোমার মা অস্থির, হয়তো পাগল হয়ে যাবে। ঘরে চল।

– তোমার স্ত্রী পাগল হলে তার দায়িত্ব তোমার। আমার কোনো মা নেই!

– যীশু আমার যীশু, তুমি কি বলছ তুমি নিজেই জানো না। ঘরে চল।

– আমি যা বলছি তা আমার ভালভাবে জানা আছে। তুমি কি বলছ তা তুমি জানো না। জীবিতের সঙ্গে মৃত্যের কোনো সম্পর্ক নেই। তোমাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

– যীশু! তুমি কিভাবে এত তাড়াতাড়ি এত বড় হয়ে গেলে?

– আমি আমার বড় হওয়ার ক্ষমতা কারো কাছে বিক্রি করিনি, তাই এত বড় হয়ে গেছি।

– এত তাড়াতাড়ি?

– কত তাড়াতাড়ি?

– মাত্র একদিনে, মাত্র একটা দিনের ভেতরে তুমি এত বড় হয়ে গেছ?

– মাত্র একটা দিন কখনো কখনো একটা বছরের সমান। কখনো কখনো একটা শতাব্দীর সমান।

– একটা শতাব্দী মানে, একশ বছরের সমান।

– হ্যাঁ, আজ একটা দিনের মধ্যেই একশ বছর পেরিয়ে গেছে!

– তা হলে আমি বৃদ্ধ?

– তুমি বৃদ্ধ।

– আমি জীবিত?

– না

– তবে?

– তুমি জীবিত নও তুমি মৃত নও।

– তবে আমি কি? আমার অবস্থান কোথায়?

– শাইলকের সাম্রাজ্যে।

– সে কোথায়?

– জীবিত নয় মৃত নয় এমন সব মানুষের পৃথিবীতে?

– সে পৃথিবী কোথায়?

– তোমার পায়ের তলায়।

– আমি তবে পায়ের তলাকার সেই পৃথিবীকে লাথি মেরে আবার বেঁচে উঠতে পারি?

– না।

– যীশু, আমার যীশু! বল কেন নয়?

– শাইলকের সাম্রাজ্যে কোনো মানুষ জীবিত নয় মৃতও নয়, বিক্রিত। কোনো বিক্রিত মানুষ বাঁচতেও পারে না মরতেও পারে না।

– তাহলে আমি জীবিত নই মৃতও নই...

– বিক্রিত!

সিকান্দার গভীরভাবে যীশুর দিকে তাকাল। অন্ধকারে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেও মানুষের চোখের ভাষা পড়া মুশকিল। সিকান্দার তার দিকে তাকিয়ে চরম বিস্ময়ে লক্ষ করে, যীশুর জায়গাতে যীশু নয়, আব্বা!

– আব্বা!

– বল।

– আপনি আমার ওপর রাগ করে আত্মহত্যা করেছেন। আমার অপরাধ আমি স্বীকার করছি। আমায় ক্ষমা করে দিন।

– তোমার অপরাধের ক্ষমা নেই।

– কেন আব্বা, কেন?

– কোনো বিক্রিত মানুষের ক্ষমা প্রার্থনার অধিকার থাকে না।

– আব্বা! আমি কি করবো, কোথায় যাব?

– তোমার আর কিছুই করার নেই। তোমার আর কোথাও যাওয়ার নেই।

– তবে?

– তোমার কাছে শুধু কালহরণের কাল।

– আব্বা!

– বল।

– এই কালহরণের কাল দিয়ে আমি কি করবো?

– কাল হরণ করবে!

– তারপর?

– কিন্তু তারপর?

– তারপরও কাল হরণ করবে!

– কতো কাল?

– অনন্ত কাল।

– কেন? কেন? কেন?

– কারণ তোমার অতীত নেই ভবিষ্যৎ নেই বর্তমান নেই স্বপ্ন নেই বাসনা নেই সত্তা নেই কল্পনা আত্মা নেই অস্তিত্ব। তোমার আছে শুধু কাল, নিস্ফলা কাল!

– আব্বা!

– বল!

– আমি এই নিষ্ফলা কালকে অতিক্রম করে যেতে পারি না?

– না।

– কেন?

– কল্পনা ছাড়া কালকে অতিক্রম করা যায় না।

সিকান্দার আব্বার কাছে আর একটু এগিয়ে যেতে চায়। তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে স্পর্শ করতে চায়। তাঁর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চলতে চায়—আব্বা, আমার কাল হরণের কালকে আমি ভেঙে ফেলতে চাই। আমাকে সাহস দিন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, সে এগিয়ে যেতেই দেখে, আব্বা নয়, আব্বার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সিকান্দার, সে নিজে!

– সিকান্দার!

– বল।

– তুমি আমি?

– না।

– তুমি কে?

– তোমার বিক্রিত আত্মা!

– হায়!

– হায় শাইলক বল!

– সিকান্দার! তুমি আমার আত্মা। আমাকে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমার! তুমি আমায় রক্ষা করো। আমায় মুক্ত কর।

– তুমি আমায় রক্ষা করতে পারোনি। আমি মুক্ত ছিলাম, তুমি আমায় বিক্রি করে দিয়েছ। কোনো বিক্রিত আত্মা কাউকে মুক্ত করতে পারে না। কাউকে রক্ষা করতে পারে না।

– তবে অন্তত আমায় দিশা দাও। পথ বাতলে দাও।

– কোনো বিক্রিত আত্মা কোনো পথের সন্ধান দিতে পারে না!

– সিকান্দার! আমার সিকান্দার!

– আমি তোমার সিকান্দার নই, শাইলকের সিকান্দার।

– হায় সিকান্দার!

– বল!

– সবাই আমায় পরিত্যাগ করেছে। আমি কি জন্যে বেঁচে আছি?

– তুমি বেঁচে নেই।

– আমি কি জন্যে মরেছি?

– তুমি মরোনি।

– আমি কি জন্যে না মরে না বেঁচে টিকে আছি?

– অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে!

– এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আমাকে কি দেবে?

– ডলার!

– ডলার আমাকে কি দেবে?

– না মরে না বেঁচে টিকে থাকার স্বাধীনতা!

প্রথম সিকান্দার আর কিছু বলার আগেই দ্বিতীয় সিকান্দার হাঁটতে শুরু করে। প্রথম সিকান্দার চিৎকার করে তাকে ডাকতে থাকে—সিকান্দার! সিকান্দার! সে আর ফেরে না। এগিয়ে যায়। প্রথম সিকান্দার তখন তার পেছনে হাঁটা শুরু করে। দ্বিতীয় সিকান্দার সামনে প্রথম সিকান্দার পেছনে। দ্বিতীয় সিকান্দার একই গতিতে হাঁটছে অথচ প্রথম সিকান্দার প্রায় ছুটছে তবু তাকে ধরা যায় না। এবার প্রথম সিকান্দার সত্যিই ছুটতে শুরু করে তবু তাকে ধরা গেল না। দ্বিতীয় সিকান্দার একই গতিতে হাঁটছে এবং প্রথম সিকান্দার প্রাণপণে ছুটছে তবুও দুজনের ব্যবধান কমে না। কমে না বরং ক্রমান্বয়ে সেই ব্যবধান বাড়তে থাকে। ব্যবধান বাড়তে বাড়তে এতটাই বাড়ে যে দ্বিতীয় সিকান্দারকে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না, সে এতোটা দূরে এগিয়ে গেছে। প্রথম সিকান্দার তখন তার শরীরের সর্বশেষ শক্তিটুকু একত্র করে ছুটছে, ছুটছে আর চিৎকার করতে করতে তাকে ডাকছে, সিকান্দার তবু আর ফেরে না। ক্রমশ সে দূরে, বহুদূরে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রথম সিকান্দার তবু ছুটছে, যে পথে দ্বিতীয় সিকান্দার চলে গেছে সেই পথ ধরে প্রাণপণে ছুটছে।

সিকান্দার জেগে না ঘুমিয়ে, দাঁড়িয়ে আছে না বসে আছে, জীবিত না মৃত এই বোধ তার এখনো পুরোপুরি ফিরে আসেনি। আব্বার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে নিজের মনে ভাবতে ভাবতে কখন সে যে বসে পড়েছিল, কখন সে যে বসে বসে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল এসব তার কিছুই খেয়াল নেই। সে ভাবছে, এখনো ভাবছে—সে দ্বিতীয় সিকান্দারের পেছনেই ছুটছে।

তার তন্দ্রার ঘোর এখানো কাটেনি। এখনো সে উঠে দাঁড়াতে পারেনি, বসে বসে হঠাৎ সে হামাগুড়ি দিয়ে ছুটতে চেষ্টা করে। সামনে ছিল একটা পুরনো কবর। পুরনো কাঁচা কবর মানে এক মানুষ সমান লম্বা গর্ত। সিকান্দার সেই গর্তের সামনে পেছনে হামাগুড়ি দিয়ে ছুটতে চেষ্টা করে। গর্তের ভেতরে হামা দিয়ে ছোটা সম্ভব নয়, ফলে গর্তের চার পাশে বার বার ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে। সে ভাবছে সে ছুটছে অথচ সে কবরের গর্তের চারপাশে ধাক্কা খেয়ে বার বার ফিরে আসছে। পুরনো কবরের গর্তগুলো বেশি গভীর থাকে না। চারপাশের মাটি ভেঙে এসে ধীরে ধীরে গর্তটাকে বুজিয়ে দেয়। তবু দীর্ঘকাল গর্ত গর্তই থাকে। সিকান্দার প্রথম গর্ত থেকে উঠে আবার এগোতে থাকে। তার মানে, সে ভাবছে, সে ছুটছে। সে ছুটতে ছুটতে অর্থাৎ হামা দিতে দিতে খানিকটা এগিয়ে যায়। কাঁটা লতায় এবং ছোটখাটো আগাছার ডালের খোঁচায় তার শরীরের অনেক জায়গা ছড়ে গেছে, সেখান থেকে হালকা ধারায় রক্তও পড়ছে, তবু তার কিছুই খেয়াল নেই। সে ভাবছে সে ছুটছে

অথচ সে হামা দিতে দিতে এক কবরের গর্ত থেকে অন্য কবরের গর্তে পড়ছে। দ্বিতীয় কবরের গর্ত থেকে ছুটতে ছুটতে মানে হামা দিতে দিতে আবার তৃতীয় কবরের গর্তে পড়ছে। আবার কবরের চারপাশে ধাক্কা খেতে খেতে অবিরাম 'সিকান্দার' 'সিকান্দার' বলে চিৎকার করতে করতে সে এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলেছে, মানে কবরের গর্ত থেকে কবরের গর্তে। সে ডাকছে কাকে? নিজেকে। সিকান্দার কাকে ডাকছে? সিকান্দারকে সিকান্দার কোথায় ছুটে চলেছে? কবরের গর্ত থেকে কবরের গর্তে! সিকান্দার! সিকান্দার! সামনে সে অজস্র সারি দেয়া কবরের গর্ত ছাড়া আর কোনো পথ নেই। সিকান্দার! হামা দিয়ে ছোটা যায় না। সিকান্দার! ঘুমের ঘোর না ভাঙলে জেগে ওঠা যায় না। সিকান্দার! জীবিত অথবা মৃতের পার্থক্য বুঝতে না পারলে জীবন অথবা মৃত্যু কোনো দিকে এগিয়ে যাওয়া যায় না।

সিকান্দার তার ছোটার কাজ এখনো চালিয়ে যাচ্ছে। সে পুরো কবরখানা হামা দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে, পড়তে পড়তে, উঠতে উঠতে একসময় আবার আব্বার কবরের কাছে ফিরে আসে। সদ্য-কবরের ওপরে টাল করা মাটি থাকে। সেই উঁচু মাটিতে বাধা পেয়ে সে থমকে যায়। থমকে গিয়েই সে আবার সেখানে সিকান্দারকে ফিরে পায়। সিকান্দার সিকান্দার থেকে ক্রমশ শাইলকে রূপান্তরিত হয়। শাইলক না সিকান্দার? সিকান্দার না শাইলক? শাইলক!

– পিতা! পরম পিতা! ত্রাণকর্তা!

– বল পুত্র!

– আমার সিকান্দারকে ফিরিয়ে দাও।

– সে আর ফিরবে না।

– সে কোথায় গেছে?

– দূরে।

– কোথায়, কত দূরে? আমায় সেখানে পৌঁছে দাও।

– প্রথম সিকান্দারের সঙ্গে দ্বিতীয় সিকান্দারের আর কখনো দেখা হবে না।

– কেন পিতা, পরমপিতা শাইলক, ত্রাণকর্তা শাইলক! কেন আমার দ্বিতীয় সত্তার সাথে আর দেখা হবে না?

– প্রথম সত্তা দ্বিতীয় সত্তাকে হত্যা করেছে!

– সিকান্দারের প্রথম সত্তা তার দ্বিতীয় সত্তাকে হত্যা করেছে?

– ঠিক তাই।

– পিতা! সিকান্দার এ পর্যন্ত কতোগুলো হত্যা করেছে?

– পুত্র! সে এ পর্যন্ত যত হত্যা করেছে তার ভেতর সবচেয়ে সার্থক হলো দ্বিতীয় সত্তার হত্যা।

– কেন পিতা?

– সত্তাকে হত্যা করা সবচেয়ে কঠিন।

– আমি তবে সার্থক খুনি?

– নিশ্চয় ।

– পিতা, এখন আমার কি কাজ?

– হত্যা করা ।

– কাকে?

– তৃতীয় সত্তাকে ।

– আমার তৃতীয় সত্তা কোথায়?

– তোমার অভ্যন্তরে ।

– আমার অভ্যন্তরে? কিভাবে তাকে চিনবো?

– যখন তুমি হত্যাকে হত্যা বলে অনুভব করবে তখনই বুঝবে তোমার তৃতীয় সত্তা সেখানে উপস্থিত ।

– তাকে কীভাবে হত্যা করবো?

– ডলার দিয়ে ।

– ডলার দিয়ে?

– ডলারের পাহাড় দিয়ে তাকে পিষে দাও । একমাত্র ডলারের পাহাড় ছাড়া আর কিছুতেই তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না ।

– আমি কোথায় ডলারের পাহাড় পাবো?

– কমিশানে!

– কিসের কমিশানে?

– আমার কমিশানে!

– তার মানে, আরো আরো আত্মা বিক্রয়?

– আরো আরো আত্মবিক্রয় ।

– সারা দেশের লোকের সত্তা-আত্মা-স্বপ্ন-কল্পনা অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ...

– ঠিক ধরেছ ।

– প্রভু! ত্রাণকর্তা! পরম পিতা! এভাবেই, অর্থাৎ একমাত্র দালালির মাধ্যমেই আমার তৃতীয় সত্তাকে হত্যা করতে পারি, তাই তো?

– ঠিক তাই ।

– পিতা! আমি নিজেকে বিক্রি করেছি এবার সারা দেশের লোক বেচে না দেয়া পর্যন্তত আমার স্বস্তি নেই, তাই তো?

– ঠিক তাই ।

সতেরো

– আমি আন্তোনিও।

– আপনার সহকারী।

– আন্তোনিও, আমি এখন কোথায়?

– কবরখানায়।

– আমি এখানে কি করছি?

– খাবি খাচ্ছেন!

– তাহলে আমার মৃত্যু খুব কাছেই?

– না স্যার!

– তবে?

– বহুদূরে

– তবে?

– আপনাকে আরো বহুকাল খাবি খেতে হবে!

– আন্তোনিও!

– স্যার?

– আমাকে মেরে ফেলুন!

– না, স্যার।

– কেন?

– তাতে পরম পিতার লোকসান।

– তাকে যা দেয়ার তা তো দিয়েই দিয়েছি, তার আবার লোকসান কিসের?

– তাকে যা দিয়েছেন তা অবাস্তব সম্পত্তি। অবাস্তব সম্পদ থেকে বাস্তবটুকু সম্পূর্ণ নিংড়ে বের করে নেয়ার পরই আপনাকে হত্যা করা হবে। তখন আপনার ইচ্ছে না থাকলেও মরতে হবে।

– আমার অবাস্তব সম্পদ থেকে কিভাবে বাস্তবটুকু আলাদা করবেন?

– আপনি জানেন নিশ্চয়, ইংরেজরা আপনার দেশ থেকে তুলো নিয়ে নিজের দেশের যন্ত্র দিয়ে কাপড় বানাতো, আর সেই কাপড় আপনার দেশের লোকেরাই চড়া দামে কিনতে বাধ্য হতো?

– হ্যাঁ, জানি।

– ব্যাপারটা সেরকম। তুলো থেকে যে কাপড় হয়, হতে পারে, এটা লোকেরা জানতো না। তারপর যখন জানলো, সে বিদ্যেটা যখন ভালোভাবে রপ্ত হলো, তারপর এল কাপড় বানাবার যন্ত্র। যন্ত্র আরো আধুনিক। আরো কম পরিশ্রমে বেশি উৎপাদনের ব্যবস্থা করলো। মুনাফার পরিমাণও বেড়ে গেল। এটাও ঠিক তেমনি একটা ব্যাপার।

– কি রকম?

– অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—এসব অবাস্তব সম্পদেরও একটা বাস্তব ভিত্তি আছে। কোনো বাস্তব ভিত্তি ছাড়া কোনো অবাস্তব সৃষ্টি হতে পারে না। আমাদের

কাজ হলো, অবাস্তব সম্পদ থেকে বাস্তবটুকু শুষে নিয়ে মাল তৈরি করা। তারপর সেই মাল অর্থাৎ আপনার মাল একটু কায়দা করে আপনার কাছেই হাজার গুণ বেশি দামে বেঁচে দেয়া।

– কিন্তু সেটা অতীত ভবিষ্যতের বেলায় খাটবে?

– খাটবে, স্যার। খেটে গেছে!

– কিরকম?

– অতীত কি ইতিহাস নয়?

– নিশ্চয়।

– ইতিহাস কি নানা ভাবে নানা ঢংয়ে আপনার কাছে পণ্য হিসেবে বিক্রি করা হচ্ছে না?

– তা বলতে পারেন।

– তাহলে এটাও বলতে পারি—বর্তমান ভবিষ্যৎ স্বপ্ন কল্পনা সত্তা আত্মা সবই পণ্য, সবই বিক্রয়যোগ্য পণ্য। টাকা দিয়ে আপনার কাছ থেকে কেনা যেতে পারে আবার একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নতুন লেবেল দিয়ে আপনার কাছেই বেচে দেয়া যায়।

– কিন্তু আপনাদের এই লেবেল মারার ব্যাপারে তো আমার কিছুই করার নেই। আমাকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি?

– আপনাকে আরো কাঁচা মালের সন্ধান দিতে হবে।

– মানে দালালি?

– ঠিক ধরেছেন, স্যার।

– কিন্তু আপনাদের অফিসে তো লোকেরা তাদের ভূত-ভবিষ্যৎ বেচার জন্য হামলে পড়েছে। আমাকে আর দরকার কেন?

– আমরা গোটা দেশের সমস্ত মানুষের স্বপ্ন কিনে নিতে চাই!

– প্রত্যেকটা মানুষের?

– প্রত্যেকটা মানুষের!

– সে তো অনেক লোকের কাজ। একা আমি আর কতো জনকে ভেড়াতে পারি?

– আপনি যত জনকে পারবেন ততটুকুই আপনার কাজ। আমাদের চিন্তার কিছু নেই ইতোমধ্যেই আমরা আপনার মতো হাজার হাজার দালাল তৈরি করে ফেলেছি।

– তবু আমাকে দরকার?

– তবু আপনাকে দরকার। কারণ প্রত্যেকটা মানুষ, আপনার দেশের প্রতিটি মানুষের স্বপ্ন কল্পনা সত্তা আত্মা দ্রোহ না কেনা পর্যন্ত আমরা থামব না।

– তারপর?

– তারপর আমরা সেই সব অসার মানুষের খুলি দিয়ে নতুন নগরী বানাবো!

– ঠিক তখন আমাকেও হত্যা করা হবে?

– অবশ্যই। তবে প্রয়োজন দেখা দিলে তার আগেও করা হতে পারে।

– যেমন?

– যেমন, আপনার তৃতীয় সত্তার মৃত্যু যদি না হয়, যদি আপনার ভেতরে তখনো চেতনা থাকে, যদি হত্যাকে হত্যা মনে হয়, যদি আপনার অভ্যন্তরে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ প্রতিরোধের অস্তিত্ব থাকে—তাহলে আপনাকে খতম করা হবে।

– আন্তোনিও!

– স্যার?

– আমার আর মুক্তি নেই?

– শাইলকের রাজত্বে কোনো মানুষ মুক্ত নয়। সবাই ক্রীতদাস, গোলাম পণ্য!

– আন্তোনিও!

– স্যার?

– কেন আমি জন্ম নিলাম?

– শাইলকের দাসত্ব করার জন্যে?

সিকান্দার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে থাকে। চিন্তা-চেতনা আবার যথাযথ কাজ শুরু করে। সে আস্তে আস্তে বাড়ির পথে এগিয়ে যায়। এখনো অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকার। রাত কতটা গভীর কেউ জানে না। মধ্যরাত না শেষ রাত নাকি অনিঃশেষ এই রাত বলা মুশকিল। সিকান্দার হাঁটতে হাঁটতে বারান্দার কাছে এসে দেখে, সুরাইয়া একইভাবে ছায়ামূর্তির মতো বসে আছে। তার দৃষ্টি অন্ধকারে। ওপাশের বারান্দায় তখনো মা তেমনিভাবে শুয়ে আছেন। তার পাশে মেয়ে দুটি আগের মতোই ঘুমে অচেতন। এমন নিস্তব্ধ রাতে, নিস্তব্ধ বাড়িতে,নিস্তব্ধ লোকালয়ে হয়তো সবাই ঘুমে অচেতন। হয়তো সবাই নয়, দুর্ভাগা কেউ কেউ এখনো পথে পথে ঘোরে।

সিকান্দার ভেতরের উঠোন থেকে বাইরের উঠোনে এল। পুকুর পাড়ে ইট বালি আর পাথর কুচির স্তূপ। বাড়ি হবে। কার বাড়ি? কারা বসবাস করবে? ইটের বাড়িতে কত সুখ? কত সুখ সুখের জীবনে? সিকান্দার হাঁটতে হাঁটতে আবার এগিয়ে যায়। এবার কবরখানার পথে নয় বাইরের পথের দিকে।

কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর পেছন থেকে আন্তোনিওর কণ্ঠ শোনা যায়—

– স্যার?

– বলুন।

– আপনি কোথায় চলেছেন?

– জানি না।

– আপনার কোথাও যাওয়া চলবে না।

– মানে?

– আপনার সমস্ত পথ রুদ্ধ!

– মানে?

– এইমাত্র পরম পিতার নির্দেশ এসেছে—তাঁর অনুমতি ছাড়া আপনি বাড়ির বাইরে পা রাখতে পারবেন না।

– তার মানে আমি নজরবন্দি?

– গৃহবন্দি!

– কিন্তু তাতে আপনাদের কি লাভ?

– আপনি এখন পরম পিতার..

– সন্তান?

– না।

– তবে?

– সম্পদ।

– তাই আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত, তাই আমার জীবন-মৃত্যু নিয়ন্ত্রিত? তাই আমার...

– তাই আপনার সমগ্র অস্তিত্ব নিয়ন্ত্রিত!

– যদি আমি বিদ্রোহ করি?

– আপনার বিদ্রোহ ক্রোধ অভিমান ক্ষোভ যন্ত্রণা বিপ্লব সবই বিক্রি হয়ে গেছে।

– যদি আমি তারপরও বিদ্রোহ করি?

আন্তোনিও তার কোমর থেকে ঝকঝকে অত্যাধুনিক পিস্তল বের করে ট্রিগারে আঙুল রেখে সিকান্দারের দিকে তাক করলো। সিকান্দার মৃদু হেসে বলল—

– খুন করবেন তাই তো? তবে তাই করুন। আমি তো তাই চাই!

– না, একেবারেই না।

– তবে?

– আহত করবো।

– যদি আমি আত্মহত্যা করি?

– কোনো দালাল কখনো আত্মহত্যা করতে পারে না!

– তবে এখন আমি কি করি?

– খাবি খান! আর...

– আর?

– কমিশান।

– এখন কোনটা খাওয়া বেশি লাভের, খাবি না কমিশান?

– কমিশান!

সমাপ্ত

শাহ্‌যাদ ফিরদাউস ২৮ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ এ জন্ম । প্রথমে কবিতা লিখতেন । ষাট দশকের শেষ থেকে সত্তর এর মাঝামাঝি পর্যন্ত উভয় বাংলার পত্র-পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ করেছেন । তারপর সিনেমার বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠলেন এবং বেশ কিছু তথ্যচিত্র তৈরি করেন । সেই সুবাদে কিছুকাল ইউরোপে কাটিয়েছেন ।

১৯৯৩ সালে 'ব্যাস' উপন্যাসের মাধ্যমে নতুনভাবে সাহিত্যচর্চার শুরু । এ পর্যন্ত আরও ১৪টি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে । তাঁর উপন্যাস ও সাহিত্য নিয়ে ইতিমধ্যেই গ্রন্থ যেমন রচিত হয়েছে, তেমনি ছোট কাগজগুলি প্রকাশ করেছে বিশেষ সংখ্যা ।

নানা ধরনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তিনি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত । 'জনচেতনা' নামক সদ্যগঠিত একটি সংস্থার তিনি যুগ্ম আহ্বায়ক ।

শাহ্‌যাদ ফিরদাউস একালের সত্যসন্ধানী এক মহৎ কথাশিল্পী। তিনি গল্পের জন্য গল্প লেখেন না (যদিও গল্প-বলায় তাঁর অসামান্য ক্ষমতা অনস্বীকার্য), গল্পকে জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করে মানুষকে সত্য সন্ধানে (জ্ঞানান্বেষণেও বটে) সাহায্য করেন। তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

-অলোক রায়

আমি শাহ্‌যাদকে নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধান ঔপন্যাসিক মনে করি। আর একটু যদি এই নিয়ে আপনারা আমাকে প্ররোচিত করেন তাহলে বলবো গত ষাট-সত্তর বছরের দু-তিনজন ঔপন্যাসিকের নামের মধ্যে একটা নাম শাহ্‌যাদ ফিরদাউস।

-অমিতাভ দাশগুপ্ত

আমরা বলতে চাই বাংলা উপন্যাসের জগতে শাহ্‌যাদ ফিরদাউস নামের এই ফিনমিনন সম্পর্কে। ১৯৯০ এর দশকে বাংলা উপন্যাসে, বলা ভাল সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই শাহ্‌যাদ ফিরদাউসের আগমন একটা বড় ঘটনা। আমাদের মত পাঠকদের কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

-পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

সংহতি

দাম : একশত ষাট টাকা

ISBN 978-98488-8215-3